আমাদের নিবেদিতা
শঙ্করীপ্রসাদ বসু লিখিত
নিত্যানন্দ ভকত চিত্রিত

আমাদের নিবেদিতা

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
ক ল কা তা ৯

নিবেদিতার বিষয়ে বাংলায় প্রথম গ্রন্থকর্ত্রী

স্বর্গতা সরলাবালা সরকারের
স্মৃতির উদ্দেশে—

"শেফালি তাঁহারি তরে ফুটেছিল তরু 'পরে
চরণে অর্পিতা!
নিবেদিতা! ভগবৎ- পদতলে চিরতরে
তুমি নিবেদিতা!"

—সরলাবালা

একালে ভারতশিল্পে আন্দোলনের পথিকৃৎ নিবেদিতা। 'ভারতশিল্পের জাগরণ আমার জীবনের স্বপ্ন'—তিনি বলেছিলেন। নিজের উইলে শিল্পের জন্য একটি পুরস্কারের ব্যবস্থা করে যাবেন, এমন ইচ্ছাও তাঁর ছিল। সে-ইচ্ছা পূরণ হয়নি। লোকমাতার সেই ইচ্ছাকে সার্থক করে তুলবার দায়িত্ব আছে আমাদের। সর্ব-সাধারণের সহযোগিতায় 'নিবেদিতা শিল্প পুরস্কার' প্রবর্তিত হতে পারবে, এই ভরসা আমাদের আছে। নিবেদিতা শিল্প-প্রতিযোগিতা ও পুরস্কারের উদ্দেশ্যে বর্তমান গ্রন্থ থেকে প্রাপ্ত সকল অর্থ ব্যয়িত হবে।

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

ছোটদের জন্য নিবেদিতার এই জীবনকথা লেখার সময়ে আমার মনে পড়েছিল একটি ভারতীয় কাহিনীর কথা, ধ্রুবর যে চিরপরিচিত কাহিনীকে নিবেদিতা নিজস্ব অপরূপ ভঙ্গিতে বলেছিলেন। ধ্রুব, পৃথিবীর মানুষের কাছ থেকে অপমান আর বঞ্চনা ছাড়া কিছু পায়নি—এমনকি যেখানে সবচেয়ে বড় আশা, সেই পিতার কাছ থেকেও। বড় ব্যথায় ধ্রুব তার মাকে জিজ্ঞাসা করেছিল—কেউ কি এমন নেই, যাঁর কাছে সত্যই আশ্রয় পাওয়া যায়, যিনি কাউকে ফিরিয়ে দেন না! ধ্রুবর দুঃখিনী মা বলেছিলেন—হাঁ, তেমন একজন আছেন—কমললোচন কৃষ্ণ। মায়ের কথাকে বড়ো বিশ্বাস করে, গভীর বনের মধ্যে বালক ধ্রুব শেষ শরণ কমললোচনের ধ্যানে বসেছিল। বাইরে সময়ের স্রোত বয়ে গিয়েছে তারপর, চারপাশে ঘন বন আরও ঘন হয়েছে, ধ্রুবর দেহ ঢেকেছে উই-মাটিতে, কিন্তু অন্তরের মধ্যে কমললোচনকে পেয়ে সে স্থির হয়ে গিয়েছিল চিরদিনের জন্য।

তাই রাত্রির আকাশ যখন তারায়-তারায় ভরে যায়, তারাগুলি ওঠে আর ডোবে, তারি মধ্যে বড়ো উজ্জ্বল একটি তারা কিন্তু অচঞ্চল—তার নাম ধ্রুবতারা। ধ্যানে চিরস্থির ধ্রুবর নামেই ঐ তারার নাম হয়েছে। পৃথিবীর ধ্রুব, আকাশে উঠে সেখানকার সবচেয়ে বড়ো তারা হয়ে ফুটে আছে।

নিবেদিতার কথা লেখার সময়ে বারবার মনে হয়েছে, আমাদের কালে পৃথিবীতে সত্যই এমন একজন মানুষ ছিলেন, যাঁর ধ্রুবতপস্যা যে-কোনো শ্রেষ্ঠ পুরাণকাহিনীর তুল্য। তাই কল্পনা করেছি—আবার যদি কখনো পুরাণ-কথা লেখা হয়, তাহলে নিশ্চয় আকাশের কোনো একটি উজ্জ্বল স্থির তারার নাম দেওয়া হবে—নিবেদিতা-তারকা।

পশ্চিম আকাশ থেকে এই তারা এসে আমাদের পূবের আকাশে আলোর দিশারী হয়েছেন। তাঁর অপরূপ পুণ্যকাহিনী বলাও ভাগ্য, শোনাও ভাগ্য।

এই বইটি লেখার পিছনে নিবেদিতা শতবার্ষিকী সমিতির সম্পাদক শ্রীধীরাজ বসুর বিশেষ উৎসাহ ছিল। তাঁকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। বিশেষ প্রীতি জানাই তরুণ প্রতিভাবান শিল্পী শ্রীনিত্যানন্দ ভকতকে। দীর্ঘদিন পরিশ্রম ক'রে তিনি বইটির সব ছবি এঁকেছেন! এখানে জানানো উচিত, বহু সন্ধান ক'রে, সমসাময়িক চিত্রাদির সাহায্য নিয়ে, ছবিগুলি আঁকা হয়েছে।

তথ্যের ব্যাপারে প্রব্রাজিকা আত্মপ্রাণা এবং মুক্তিপ্রাণা-রচিত নিবেদিতা-জীবনীর কাছে আমি ঋণী ; সবচেয়ে ঋণী লিজেল রেমঁ র—নিবেদিতা-জীবনীর কাছে, বাংলায় যার মনোরম অনুবাদ করেছেন শ্রীনারায়ণী দেবী।

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় পাণ্ডুলিপির কিছু অংশ পড়ে প্রয়োজনীয় মন্তব্য করেছেন।

লেখার সময়ে শ্রীবিমলকুমার ঘোষের কাছে সাহায্য আমি পেয়েই থাকি ; এক্ষেত্রেও নিশ্চয় পেয়েছি।

যাঁরা সাহায্য করেছেন তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ।

'কী সুন্দর! কী পবিত্র!

ছোট্ট মেয়েটির গভীর নীল চোখের দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে যান ধর্মযাজক। মনে হয় যেন আকাশের সেরা তারার আলো নেমেছে ঐ দুই চোখে।

পরম স্নেহে মেয়েটির মাথায় হাত বুলিয়ে তিনি বলেন, 'মাগো, অনেক দূরে ভারতবর্ষ বলে একটি দেশ আছে। সে দেশের ডাক যদি কোনোদিন তোমার কাছে আসে, সাড়া দিও।'

ভারতবর্ষ! অদ্ভুত দেশ! সে দেশের গল্প মেয়েটি তার বাবার কাছে শুনেছে বটে! ঐ ধর্মযাজক মেয়েটির বাবার বন্ধু; তিনি সবে ভারত থেকে ফিরেছেন নিজের দেশ ইংলণ্ডে। ইংলণ্ডে বসেই কথা হচ্ছিল। সে অনেক বছর আগেকার কথা।

মেয়েটির নাম মার্গারেট। ভারতের ডাক একদিন সত্যই তাঁর কাছে এসেছিল। তিনি সাড়া দিয়ে বলেছিলেন, 'ভারত আমার দেশ, আমার মা।' ভারতকে মা বলে ডেকে তিনি ভারতের মেয়ে হয়েছিলেন, আর সকল ভারতবাসীর বোন।

তিনিই আমাদের নিবেদিতা।

॥ ১ ॥

ইউরোপের বিখ্যাত দেশ ইংলণ্ড, সমুদ্র-ঘেরা দ্বীপ। তার গায়ে আর একটি দ্বীপ—আয়ারল্যাণ্ড।

সেই আয়ারল্যাণ্ডের এপার থেকে ওপার পর্যন্ত বিদ্যুতের মতো ছুটে যাচ্ছে একটি মানুষের নাম—জন নোবল। জন নোবল ধর্মযাজক। ধর্মের সঙ্গে দেশকেও ভালবাসেন প্রাণ দিয়ে। তাঁর দেশ আয়ারল্যাণ্ডকে পরাধীন করে রেখেছে ইংলণ্ড। এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী তিনি। ধর্মের আগুন আর দেশপ্রেমের আগুন জ্বলছে তাঁর বুকে। তাই নিয়ে তিনি ঘুরে বেড়ান আয়ারল্যাণ্ডের গ্রামে-গ্রামে, শহরে-শহরে।

আইরিশ বিদ্রোহীদের শায়েস্তা করতে ইংরেজ-সরকার নানা আদেশ জারি করে। বিদ্রোহীরা জমি কিনতে বা ব্যবসা করতে পারবে না; স্কুলে মাস্টারী বা আদালতে জুরীর কাজ করতে পারবে না; ঘোড়ায় চড়া বা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে চলা তাদের বারণ। এমনকি মরার পরে সাধারণের গোরস্থানে তাদের কবর দেওয়াও চলবে না।

অসহ্য অত্যাচার চালাতে লাগল ইংরেজ-সরকার। আইরিশদের দমানো হল বুকে হাঁটু দিয়ে; চাবুকে-চাবুকে ক্ষতবিক্ষত করা হল; ঝোলানো হল ফাঁসিকাঠে। এরই মধ্যে জন নোবল ঘুরতে লাগলেন অভয়মন্ত্র নিয়ে—যেখানে বিপদ, যেখানে মৃত্যু—সেখানে।

জন নোবল বিয়ে করেছিলেন তাঁরই যোগ্য একটি মেয়েকে। নাম—মার্গারেট এলিজাবেথ নীলাস। স্যামুয়েল রিচমণ্ড নোবল এঁদের সন্তান। জন নোবল মারা যাবার পরে দারুণ দারিদ্র্যের মধ্যে পড়ে পরিবারটি। তাই স্যামুয়েলকে বাধ্য হয়ে ব্যবসায়ে

নেমে পড়তে হয়। ভালই রোজগার করতে আরম্ভ করেছিলেন। বিয়েও করেছিলেন মেরী ইসাবেল হ্যামিলটন নামে চমৎকার একটি মেয়েকে। বেশ সুখে জীবন কাটছিল। কিন্তু সুখের জীবন তাঁর সইল না, তিনি যে জন নোবলের ছেলে। চারিধারে মানুষের যখন এত কষ্ট, তিনি চুপ করে থাকতে পারেন কখনো? বিদ্রোহী পিতার রক্ত দোলা খেয়ে ওঠে পুত্রের বুকে।—না না না, কখনো নয়, এই সুখের স্বাচ্ছন্দ্যের জীবন আমার জন্য নয়। তিনি ব্যবসা বিক্রী করে দেন। একটি মেয়ে হয়েছিল, তাকে নিজের মায়ের কাছে সঁপে দিয়ে পত্নীকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন নতুন জীবনের সন্ধানে। তাঁর পত্নীও দ্বিধা করেননি, কারণ তাঁর বাবাও আয়ারল্যাণ্ডের আর একজন বিখ্যাত দেশপ্রেমিক বীর।

স্যামুয়েল নোবল যে-মেয়েটিকে নিজের মায়ের কাছে রেখে এসেছিলেন, তার নাম দিয়েছিলেন—মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল। তার জন্ম হয় উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের ডানগানন শহরে, ১৮৬৭ সালের ২৮শে অক্টোবর। এই মেয়েটিই ভারতের ইতিহাসে বিখ্যাত হবেন নতুন নাম নিয়ে। সে নাম—ভগিনী নিবেদিতা।

জীবনের নতুন পথে বের হয়ে স্যামুয়েল নোবল হাজির হয়েছিলেন ইংলণ্ডের কয়লাখনি-অঞ্চল—ম্যান্‌চেসটারে। সেখানে মজুরদের মধ্যে ধর্মযাজক হয়ে কাজ করতে লাগলেন। সেই সঙ্গে গরীবের সেবার কাজও। গরীব মানুষে ভর্তি জায়গাটি। ভগবানের প্রতি ভালবাসায় ভরা জীবনের ছবি তিনি তুলে ধরলেন।

ওদিকে নিজের যে-মেয়েটিকে তার ঠাকুরমার কাছে তিনি রেখে এসেছিলেন, সে ঠাকুরমাকে আঁকড়ে ধরেছিল একান্ত আপনজন বলে। মা বাবা কাছে নেই, তাই ঠাকুরমাই সব। বাবা মা'র কাছ-ছাড়া মেয়েটি বড় অভিমানী; অল্পেই তার মনে ব্যথা লাগে। আবার রহস্যে ভরা উদাস তার মন। গাছ-পালা পশু-পাখির সঙ্গে

তার মিতালী। ঠাকুরমার ফুলে-ভরা বাগানে সে ঘুরে বেড়ায় সারাদিন। 'এই ফুলবিছানো বাড়িখানাই ওর রংমহলের এলাকা। ও ঘুরে-ঘুরে দেখে, বিকালবেলা গাছে-গাছে ব্লু-বেলগুলি কেমন দোল

খায়, লিলির পাপড়ি খোলে ধীরে-ধীরে, প্রজাপতিরা তার উপরে উড়ে বসে মধুর লোভে। প্রতিটি পাখির সঙ্গেই তার চেনা-পরিচয়। কোন্ শরবনের ঝলমলে আড়ালে রূপালী পরীর বাসা, তাও তার জানা।'

তারপরে সন্ধ্যা হয়, রাত ঘনায়, ঠাকুরমা এসে বসেন আগুনের ধারটিতে। তাঁর মাথায় ধবধবে সাদা চুল, তার উপরে কালো লেসের ওড়না। গভীর প্রসন্ন মুখখানি। আশেপাশে সবাই তাঁকে ভালবাসে আর সমীহ করে। লোকজন আসে যায় নানা কাজে। জর্জ-কাকা এসে বসেন। মার্গারেট চুপটি করে বসে থাকে। ঠাকুরমার রেখা-আঁকা মুখের উপরে আগুনের আভা পড়ে কী অদ্ভুত দেখায়! চেনা ঠাকুরমা অন্য জগতের হয়ে যান। যেন আকাশের মায়াপুরীর কেউ। অবাক-অবাক চোখে সে তাকিয়ে থাকে। তারপরে মাথায় ঝিম্ ধরে। জর্জ-কাকার কোলে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়ে। কাকা মাথায় আস্তে-আস্তে হাত বুলিয়ে দেন। ঘুমের পরীরা দু' চোখের পাতায় আলতো পায়ে নেমে পড়েছে তখন···

সাত বছরের মার্গারেট বিশ্বাস করতে পারছে না। একি হলো! আমার ঠাকুরমাকে নিয়ে চলে গেল! যাবার আগে ঠাকুরমা একটা কথাও বলে গেলেন না! একটু আগে ঐ তো তিনি আধ-শোয়া হয়ে ছিলেন। রোজ যা পড়তেন সেই বাইবেল বইখানি তাঁর কোলের উপরে খোলা ছিল। যে-স্তোত্রটি ভালবাসতেন সেটি ধীরে-ধীরে পড়লেন। তারপর ঘুরে বসলেন। চোখ বুজলেন। রোজই তো অমনি ভাবেই চোখ বোজেন। কিন্তু চোখ খুললেন না কেন—কেন? একি হলো!

ঠাকুরমা মারা গেছেন। মার্গারেটের ছোট্ট বুক পাথর হয়ে যায়। বাবা এসেছেন। তিনি মার্গারেটকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন। অসহ্য খারাপ লাগছে মার্গারেটের। তার বাবা যেখানে থাকেন সেখানকার শহুরে অঞ্চল মার্গারেটের একদম ভাল লাগে না। ঘিঞ্জি,

ধুলো, ধোঁয়া। মনে হয়, সব-কিছু অপরিচিত। সেখানে সে কাউকে চেনে না। তার ঠাকুরমা সেখানে নেই। তাঁর ফুলে-ভরা, গানে-ভরা, পরী-ভরা বাগান সেখানে নেই।

না, মার্গারেট কিছুদিনের মধ্যে আবার তার বাগানটিকে ফিরে পেল। তার বাবার শরীর ভেঙে পড়ায় তিনি ঘিঞ্জি শহর ছেড়ে নিরিবিলি এক গাঁয়ে চলে গেলেন। সেখানে একটি ভাই ও একটি বোনকে সাথী পেল মার্গারেট। সারা গাঁ-টাই তার কাছে বাগানের মতো হয়ে দাঁড়াল। 'সেখানে ঝোপে-ঝোপে পাখির বাসা, ঘাসের ফাঁকে-ফাঁকে কত না ঝিঁঝি আর প্রজাপতি, নদীর বুকে গোপন ফোয়ারা। যখন ঝিক্‌মিকিয়ে রোদ ওঠে, তখন ওরা পাথরের উপরে টিকটিকির মতো শুয়ে-শুয়ে রোদ পোয়ায়। যখন বৃষ্টি পড়ে রিম্‌ঝিম্ রিম্‌ঝিম্, ওরা বাগানের পথে ছপ্‌ছপিয়ে ঘুরে বেড়ায়।'

বাবার দিকে তাকিয়ে মার্গারেটের কষ্ট হয়। মার্গারেটের বয়স এখন দু'এক বছর বেড়ে গেছে, বুদ্ধি-সুদ্ধিও হয়েছে কিছু-কিছু। সে দেখে, অসুখ হয়ে বাবা শুয়ে আছেন। সে বোঝে, বাবার সঙ্গী দরকার। তাই যতক্ষণ পারে বাবার কাছে থাকে। বেড়ানো, খেলাধূলা প্রায় ছেড়েই দিয়েছে। বাবা অনেক কষ্টে গির্জার উপাসনায় যান। বুকে তাঁর বড় যন্ত্রণা—সে-ব্যথা চেপে ভাষণ দেন। তিনি বলেন : এই-যে জগৎ দেখছ, এর একজন মালিক আছেন। তাঁকে এমনি চোখে দেখা যায় না। কিন্তু তিনিই আড়ালে থেকে সব চালাচ্ছেন। তিনি হলেন ভগবান। তাঁর পুত্র হলেন প্রভু যীশু। পাপে ডুবে-থাকা মানুষকে উদ্ধার করবার জন্য তিনি পৃথিবীতে এসেছিলেন। যীশুর মা মেরী। মার্গারেট মুগ্ধ হয়ে দেখে—মেরী-মায়ের কোলে শিশু যীশুর ছবি কি অপরূপ!

আবার মায়ের কাছে সে ঠাকুরদাদার গল্প শোনে। ঠাকুরদাদা হলেন নাম-করা দেশনেতা। রূপকথার মতো তাঁর কাহিনী।

মার্গারেট আবেগে শিউরে ভাবে, উঃ! কত বড় বংশের মেয়ে আমি। আমার ঠাকুরদাদা সেরা বীর; আবার ধর্মের মানুষ। ঠাকুরমাও কী বড়, কী ভালো। আমার বাবার মতো ভালো কেউ হয় না-কি! তিনি সবার সেবা করেন; ধর্ম নিয়ে আছেন। আমার মা কী-যে মিষ্টি মানুষ। দুঃখ-কষ্টের মধ্যে থাকলেও হাসিটি মুখে লেগেই আছে। দাদামশায়—তিনিও আয়ারল্যাণ্ডের মানী লোক। আমার এমন বংশ—আচ্ছা আমি নিজে কি হবো?

মার্গারেট ভেবে চলে—সে কী হবে?

'কেউ জানে না—ও কি হবে! কিন্তু ও যদি ভগবানের ডাক শুনে কোনোদিন ঘর ছাড়তে চায় ওকে বাধা দিও না'—মার্গারেটের বাবা বললেন পত্নীকে।

তাঁর শেষক্ষণ ঘনিয়ে এসেছে। বয়স মাত্র ৩৪, কিন্তু মৃত্যুর কালো ছায়া নেমেছে তাঁর উপরে। তিনি আলোর ধ্যান করতে লাগলেন। ওগো ভগবান, আলো দাও! তোমার আলো আছে স্বর্গে। সে আলো পৃথিবীতেও থাকবে যদি কেউ আলোর জন্য তপস্যা করে। স্যামুয়েল নোবল দেখেন, তাঁর মেয়েটির মুখে যেন সেই আলোরই ইশারা। তাঁর বন্ধুও সেই কথাই বলে গেছেন। মৃত্যুর আগে পত্নীকে ডেকে তাই বললেন, 'এ মেয়ে যদি ধর্মের ডাক শুনে চলে যেতে চায়, একে বাধা দিও না।'

চোখের জলে মার্গারেটের মায়ের মুখ ভেসে যাচ্ছে। তাঁর একান্ত আপনজন চলে যাচ্ছেন। বুক ফেটে যাচ্ছে যাতনায়। ছেলেমেয়েগুলিকে নিয়েই এখন তাঁকে বাঁচতে হবে। তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো যেটি, তাকেই ছেড়ে দিতে হবে ভবিষ্যতে! হে ভগবান!!

হাঁ দেবেন, নিশ্চয় দেবেন, স্বামীর অনুরোধ ছাড়াও তার অন্য কারণ ছিল। সে কথা পরে।

॥ ২ ॥

মার্গারেটকে স্কুলে ভরতি করে দেওয়া হল। স্কুল তো নয়, জেলখানা। ঘরগুলো অবশ্য বড়-বড়, আলো-বাতাস খুব। হলে হবে কি, চারদিকে পাঁচিল ঘেরা, আর খুব কড়া আইন। মার্গারেট ছিল বনের পাখি, এখানে সে হয়ে গেল খাঁচার পাখি। হাঁপিয়ে ওঠে।

অল্পদিনেই সে কিন্তু মানিয়ে নিল। তার বুদ্ধি খুব, জানবার ঝোঁকও খুব। আবার নিজের স্বপ্নে কল্পনায় তলিয়ে থাকে মন। ঝলমলে চেহারা। সঙ্গিনীরা নেত্রী বলে মেনে নেয়। সে যখন কাজ করতে বলে—সবাই করে, যখন গল্প বলে—সবাই শোনে। বাইবেল নামে খ্রীস্টানদের যে ধর্মের বই আছে, তার গল্প সে বলে যায়—

'চলো আমরা যাই সেই অনেক কাল আগে এক পথের ধারে, যেখানে জেকব ঘুমিয়ে পড়েছেন পাথরের উপর মাথা রেখে। জল খাওয়ার পরে ভেড়ার দল আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কেউ শাদা, কেউ কালো, কেউ নানা রঙের। হঠাৎ মেঘের বুক চিরে আকাশ থেকে নিঃশব্দে নেমে এল সোনার সিঁড়ি। সে-পথে দেবদূতদের আনাগোনা। ভরা জোছনায় লঘু পায়ে তাঁদের চলাফেরা। শুভ্র বসনে ঢেউ খেলছে হাওয়ায়-হাওয়ায়…'

মার্গারেটের গলায় যাদু আছে। সবাই নিঃশ্বাস বন্ধ করে শুনে যায়। যখন সে অভিনয় ক'রে কিছু দেখায়, সবাই পরমাগ্রহে চেয়ে থাকে। অভিনয়ের সময়ে মার্গারেট নিজেকে ভুলে যায়। একবার

তো দেবদূতেরা কিভাবে শয়তানকে কাবু করেছিল দেখাতে গিয়ে নিজের একগোছা চুলই উপড়ে ছিঁড়ে ফেললে।

সোনার মতো তার চুল। বড় সুন্দর। আলোকলতার মতো দুলতে থাকে—কিরণ-মাখা উজ্জ্বল কপালের পাশ দিয়ে। বুঝি একটু রূপের গরব হয়েছিল তার। বড় দিদিমণি ছিলেন মিস ল্যারেট। কাঁচি দিয়ে কচ্‌কচ্‌ করে সেই চুলের গোছা কেটে দিয়ে, কড়া গলায় বললেন, 'এক বছরের মধ্যে ও-চুল আর রাখতে পারবে না।'

বড় দিদিমণি কী কড়া! আর রাশভারি! কিন্তু কী ভালো! মার্গারেটের ভয় করে, আবার ভালোও লাগে। তিনিই তো শিখিয়েছেন, জীবনটা সহজ নয়, বড় হওয়ার জন্য লড়াই করতে হয়, ত্যাগ করতে হয় অনেক-কিছু। বড় দিদিমণি কঠিন কিন্তু খাঁটি মানুষ।

কিছুদিনের মধ্যে তিনি স্কুল ছেড়ে চলে গেলেন। তাঁর পরে যিনি বড় দিদিমণি হয়ে এলেন তাঁর নাম মিস্ কলিন্স। খুবই কাছের মানুষ। তিনি বিজ্ঞান পড়ান, কিন্তু সাহিত্য ভালবাসেন। মার্গারেটের উন্মুখ উৎসুক ভাব, জানবার আগ্রহ, তাঁর চোখে পড়ল সহজেই। মেয়েটিকে কাছে টেনে নিলেন। তাকে বিজ্ঞানের সত্যগুলি শেখাতে লাগলেন। সাহিত্যের রসে ভরিয়ে দিলেন তার মন। মার্গারেট প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে যায়, তিনি উত্তর দিয়ে যান একের পর এক।

স্কুলের লম্বা ছুটি যখন হয়, মার্গারেট আর তার বোন একসঙ্গে দাদুর বাড়িতে ফিরে যায়। কী মজা তখন। দাদু ওদের নিতে আসেন বেলফাস্ট বন্দরে। আদরে জড়িয়ে ধরেন দু'বোনকে দু'হাতে। বোন দুটিও দাদুর হাত ধরে জোরে-জোরে পথ হাঁটে। দাদুর সঙ্গে যেতে-যেতে গর্বে এপাশ-ওপাশ চায়। তাদের দাদু যে আয়ারল্যাণ্ডের স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা। এই দাদু যখন নাতনীকে দেখিয়ে

বলেন, 'আমাদের এই মেয়েটি যে-সে নয়, এ হল স্বয়ং জন নোবলের ছেলের মেয়ে'—তখন মার্গারেটের মুখ লাল হয়ে ওঠে, কিন্তু বুক ফুলে ওঠে গর্বে।

॥ ৩ ॥

স্কুল থেকে ভালভাবে পাশ করে মার্গারেট যখন বেরুলেন তখন তাঁর সামনে অনেক স্বপ্ন, অনেক কাজ।

প্রথম কাজ, মায়ের কষ্ট দূর করা। দুঃখ-কষ্টের মধ্যে তিনি আছেন। তাঁর জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য আনতে হবে। ভাইয়ের লেখা-পড়ার ব্যবস্থাও করা চাই।

সতের বছর বয়সে মার্গারেট চাকরি নিলেন কেসউইক বলে এক জায়গার একটি স্কুলে। জীবনের প্রথম চাকরি। জায়গাটি মনোরম। পাহাড় আছে, হ্রদ আছে, আর আছে পুরনো বড়-বড় গাছ, যার তলায় আবছা অন্ধকারে রহস্যময় পরিবেশ। বিখ্যাত ইংরেজ কবি কোলরিজ এখানে ছিলেন। কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের অন্তরঙ্গ এক বন্ধু এই গ্রামের ধর্মযাজক। এমনই স্থানে ইতিহাস আর সাহিত্য পড়াতে শুরু করলেন মার্গারেট।

পড়ানোর কাজে গভীর আনন্দ পেতেন। তবু মনে হল, এই স্বাচ্ছন্দ্যের জীবন ছেড়ে দেওয়াই ভাল। প্রকৃতির শোভা অপরূপ, তবু মানুষের কান্নার যে সীমা নেই! দুঃখী মানুষদের সেবা করার কাজ নিয়ে দু'বছর পরে মার্গারেট চলে গেলেন রাগবি বলে এক জায়গায় অনাথ আশ্রমে। যাদের কেউ নেই এমন সব মেয়েরা সেই অনাথ আশ্রমে আছে। তাদের সাহস দিয়ে, শিক্ষা দিয়ে, গড়ে তোলাই হবে তাঁর কাজ।

কেসউইকের কাজ ছেড়ে দিয়ে একবছর পরে খনি-অঞ্চল রেক্সহামে এক উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মার্গারেট যোগ দিলেন। ধূলো ধোঁয়ায় ভরতি শহরটি। অল্প আয়ের খনি-মজুরেরা সেখানে নিদারুণ কষ্টের মধ্যে থাকে। মার্গারেট সেখানে বস্তীতে-বস্তীতে ঘুরে দেখেন—কোথায় আছে অনাথ আতুর, রোগী, আসন্নপ্রসবা নারী। তাদের কাছে পৌঁছে দেন সেবা, সাহায্য।

এতেই থামেন না। তিনি ভাবেন, এদের অভাব অভিযোগের, দুঃখ-যন্ত্রণার কথা যদি লিখে ছাপিয়ে সকলের কাছে হাজির করতে পারেন তাহলে সেইসব লেখা পড়ে অনেকেই এগিয়ে আসবে সাহায্য করতে। দীনদুঃখীর অবস্থা সম্বন্ধে মার্গারেট তাই খবরের কাগজে লিখতে আরম্ভ করলেন। তার ফলে অনেক টাকা চাঁদা উঠল। তাই দিয়ে তৈরী হল লঙ্গরখানা, ডাক্তারখানা, খেলার মাঠ, গ্রন্থাগার; আরও কত কি! সকলের মধ্যে কল্যাণলক্ষ্মীর মতো বিরাজ করতে লাগলেন। সবার মুখে-মুখে তাঁর নাম ফিরতে লাগল।

এই সময়েই মার্গারেটের বিয়ের কথা ওঠে। পাত্রটি দেখতে সুন্দর, চরিত্রবান এবং আদর্শবান। পেশায় ইঞ্জিনীয়ার। ছেলেটির সঙ্গে মার্গারেটের মনের মিল খুবই।

বিয়ের ঠিকঠাক। এমন সময়ে ছেলেটি মারা গেল দারুণ ক্ষয়রোগে।

মার্গারেট রেক্সহামে থাকতে পারলেন না। চেস্টারে চলে এলেন।

চেস্টারের কাছাকাছি লিভারপুল বড় শহর। সেখানে মার্গারেটের বোন শিক্ষকতার কাজ নিয়েছেন। ভাই রিচমণ্ড সেখানেই কলেজে পড়েন। মাও এলেন ওখানে। অনেকদিন পরে পরিবারের মানুষগুলি একত্র হল। আপনার মানুষগুলিকে কাছে পেয়ে মার্গারেটের আনন্দের সীমা রইল না।

শিক্ষকতার কাজ করতে-করতে শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ে মার্গারেট অনেক ভেবেছেন। পেস্তালাৎস্কি আর ফ্রবেল নামে ইউরোপের দুই

নামজাদা পণ্ডিত এ-ব্যাপারে যা বলেছেন তা মার্গারেটের খুব মনে ধরে। ওঁরা বলেছিলেন, শিশুদের মন কোন্ দিকে যেতে চায়, কি পেতে চায়, তার খোঁজ আগে নাও, তারপর সেইমতো শিক্ষা দাও। পদ্মের মতো শিশুদের মন, সূর্যের আলোয় তা অল্পে-অল্পে পাপড়ি মেলে, সৌরভ ছড়ায় ; যদি আলোবাতাস না থাকে তাহলে শিশু-মন ম্লান হয়ে শুকিয়ে যায়। শিশুদের মনে আলোবাতাস বইয়ে দেওয়াই শিক্ষকের কাজ।

ফ্রবেলের এক শিষ্যা মিসেস লী ডিউ একদিন তাঁকে ডেকে বললেন, 'আমি লণ্ডনে নতুন ধরনের এক স্কুল খুলছি, তুমি তাতে যোগ দেবে ?'

মার্গারেট কি যাবেন লণ্ডনে! লণ্ডন—ইংলণ্ডের রাজধানী—পৃথিবীর সবচেয়ে বড় শহর—সর্বজাতির লোক থাকে বলে তাকে ছোটখাট একটা পৃথিবী বলা হয়—সেই লণ্ডনে কি মার্গারেট যাবেন ?

নিশ্চয় যাবেন। তিনি যে এখন অনেক বড় হয়ে উঠেছেন দেহে-মনে। প্রতিভার দীপ্তিতে ঝলমল। মনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ার আকাঙ্ক্ষা। লণ্ডনের মতো জায়গাই মার্গারেটের যোগ্যভূমি এখন।

মিসেস লী ডিউ-এর স্কুলে কাজ করার সময়ে, শিশুদের মধ্যে থেকে, তাদের শিখিয়ে পড়িয়ে, তাঁর খুশির সীমা থাকে না। কয়েক বছর পরে মিসেস লী ডিউ-এর স্কুল তিনি ছেড়ে দিলেন। এবার গড়ে তুললেন নিজের স্কুল, লণ্ডনের উইম্বলডন পাড়ায়। তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন এবেনজার কুক বলে একজন শিল্পী, যিনি রঙের আর ছবির সঙ্গে, শিশুদের পরিচয় ঘটিয়ে দেবার ব্রত নিয়েছেন।

মার্গারেটের জীবন কিন্তু কেবল স্কুলের কাজেই বাঁধা পড়ে ছিল না। ইতিমধ্যে লেখিকা বলে তাঁর নাম হতে শুরু হয়েছে। তরুণ এক লেখক-গোষ্ঠীর মধ্যমণি হয়ে উঠেছেন। রাজনীতি, সমাজনীতি, বিজ্ঞান—সব বিষয়ে তাঁর লেখা ছাপা হচ্ছে পত্র-পত্রিকায়। 'সিসেমি ক্লাব' বলে একটি প্রতিষ্ঠানের সম্পাদিকা তিনি। সেখানে তাঁর

সহায়করূপে পেয়েছেন—আর ম্যাকনীল (পরে লর্ড কুশেনডন), লেডি রিপন, লেডি ইসাবেলা মার্জেসনকে। উইলিয়ম স্টেডের মতো খ্যাতনামা সম্পাদকের সঙ্গে হয়েছে বন্ধুত্ব, প্রিনস্ ক্রপটকিনের মতো বিখ্যাত রাশিয়ান বিপ্লবীর সঙ্গে গভীর পরিচয়। সিসেমি ক্লাবে নাম-জাদা লোকজন আসেন, বক্তৃতা করেন, আলোচনা চলে। বিরাট বৈজ্ঞানিক টি এইচ হাক্সলী, সাহিত্যজগতে তখন উদীয়মান প্রতিভা জর্জ বার্নার্ড শ'ও সেখানে আসতেন। মার্গারেট এই সমাবেশে তর্ক করেন, বক্তৃতা করেন, নারীর অধিকারের পক্ষে লড়াই করেন। সকলকে নাড়া দেওয়ার মতো ব্যক্তিত্ব তাঁর। সর্বদিকে এক বিজয়িনী নারী তিনি।

কিন্তু কেউ কি মার্গারেটের হৃদয়ের সবটুকু সংবাদ রাখত? জানত কি তাঁর গভীর জিজ্ঞাসার কথা, যাতনার কথা? বিয়ে করে সংসারী হতে চেয়েছিলেন, কিন্তু বিধাতার কোন্ ইচ্ছায় কে জানে, তা সার্থক হয়নি। হয়তো নিজের পরিবার নয়, ভবিষ্যতে মানব-পরিবারের সেবা করতে হবে বলেই এমনটি ঘটেছিল। জীবনের লক্ষ্য কি, ধর্মের আসল রূপ কি, সে বিষয়েও মার্গারেটের মনে অনেক প্রশ্ন জেগেছে, তারও মীমাংসা হয়নি। মার্গারেট একবার এক গির্জায় যোগ দিয়েছিলেন মানুষের সেবার জন্য। কিন্তু সেখানকার কর্তাদের মনের সংকীর্ণতা দেখে শিউরে উঠলেন। তাঁরা বলেছিলেন, কেবল আমাদের গির্জার সদস্যদের বেছে-বেছে সাহায্য করবে তুমি। মার্গারেটের মন বিদ্রোহী হয়ে সরে এসেছিল। দরকার নেই এমন গির্জার। আমি সাক্ষাৎ পূজা করব গির্জার প্রভু স্বয়ং যীশুখ্রীস্টের। আহা, আমার প্রভু যীশু, মানুষের পরিত্রাণের জন্য পৃথিবীতে এসেছিলেন। ঈশ্বরের পুত্র তিনি, নিষ্ঠুর অন্ধ মানুষেরা তাঁর মহিমা না-বুঝে তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করে মেরেছিল—সেই প্রভুই আমার হৃদয়ের দেবতা।

এক জায়গায় কিন্তু মার্গারেটের মন ধাক্কা খায়; খ্রীস্টান শাস্ত্রের একটা কথা তিনি কিছুতেই মেনে নিতে পারেন না। খ্রীস্টান শাস্ত্রে

বলা হয়েছে, একমাত্র প্রভু যীশুই মুক্তি দিতে পারেন। আর বলা হয়েছে, সব মানুষ অনন্ত পাপে ডুবে আছে। এসব কথায় মার্গারেটের মন সায় দেয় না। সব মানুষই কি পাপের মধ্যে আছে? তা কেন, পাপের বাইরেও তো কেউ থাকতে পারে। প্রভু যীশু ত্রাণকর্তা একথা সত্য, কিন্তু অন্য ত্রাণকর্তা আছেন, এমনও তো হতে পারে!

তেমনি আর একজন ত্রাণকর্তার সন্ধান পেলেন মার্গারেট—ভারতের বুদ্ধ। প্রভু বুদ্ধ। অপরূপ! অপরূপ! মার্গারেটের মন জুড়িয়ে যায়। অপরূপ ধ্যান! অপরূপ জ্ঞান! মানুষই সব, সব-কিছুই মানুষের হাতে, সবাই বোধিলাভ করে বুদ্ধ হতে পারে—বুদ্ধ বলেছেন। মার্গারেটের উচ্ছ্বসিত অন্তর বলে—এই তো, এঁকেই তো চাইছিলাম!

তবু—তাঁর প্রশ্ন একেবারে শেষ হয় না। কত হাজার বছর আগে খ্রীস্ট জন্মেছিলেন; তারও কতদিন আগে এসেছিলেন বুদ্ধ; তাঁরা কত দূরের! আমার যে আরও কত প্রশ্ন আছে, আরও কত সংশয়। আমি একালের মানুষ, আমি নতুন। আমার নতুন পিপাসা, নতুন জিজ্ঞাসা, আমার চাই নতুন সাক্ষাৎকার—সত্যের···

তিনটি মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছেন মার্গারেট। বেদনায় ফেটে গেছে বুক। মৃত্যুই কি শেষ? না-কি মৃত্যুর অতীত কিছু আছে, কোনো অমৃত? যদি থাকে কোথায় আছে তা? সে অমৃতের সন্ধান জানো—আছো এমন কোনো অমরদূত? যদি থাকো—সাড়া দাও! সাড়া দাও!

মার্গারেটের হৃদয় জ্বলছে সাত বছর ধরে।—সাড়া দাও! সাড়া দাও!

কে ইনি ?

এত সৌন্দর্য, এত মহিমা, একি মানুষের ? একেবারে যেন ধ্যানী বুদ্ধ বসে আছেন! মা মেরীর কোলে শিশু যীশুর মুখে যে যাদু-মাখানো কোমল ভাবটুকু ছবিতে ফুটিয়েছেন মহাশিল্পী র‍্যাফেল, সেই যাদু এঁর মুখে। কে ইনি ?

আর গলার স্বর ?

মার্গারেট প্রাচীন ভারতের যত কথা এতদিন শুনে এসেছেন, কল্পনার চোখে দেখে এসেছেন—সবই যেন মনে ভিড় করে আসে ঐ গলার স্বর শুনে, আকর্ষণ করে নিয়ে যায় দূর ভারতের মায়ালোকে। মার্গারেট শুনেছেন—সূর্যাস্তকালে কূপের কাছে কিংবা গ্রামের ধারে, বৃক্ষতলে, বসে থাকেন ঋষি—দিনশেষের আলো সোনা মাখিয়ে দেয় তাঁর মুখে—তাঁর চারপাশ ঘিরে জমে ওঠে রহস্যের আবছা আঁধার—এঁর কণ্ঠে যেন সেই ঋষির কণ্ঠ।

'শিব! শিব!'—ইনি বলেন মাঝে-মাঝে। 'শিব! শিব!'—কি বিচিত্র শব্দ! কি বিচিত্র উচ্চারণ! কাঁপিয়ে তোলে সর্ব সত্তা। তারপর কোথায় তলিয়ে যাই, কোন্ অতলে, মনে হয় যেন সন্ধান পেয়ে গেছি—হাঁ, সন্ধান পেয়ে গেছি যাকে খুঁজছি এতদিন !

ইনি—স্বামী বিবেকানন্দ।

ভারতবর্ষই যেন মূর্তি ধরে এসে দাঁড়িয়েছে স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে।

১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাস তখন।

বহুদিন পরাধীন ভারতবর্ষ। তার গতি গিয়েছিল থেমে। দুঃখ-কষ্ট-দারিদ্র্যের শেষ ছিল না। শোষিত অপমানিত দেশ। মনে হয়েছিল, এদেশের উদ্ধারের কোনো সম্ভাবনা নেই। এমন সময়ে

১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে তিরিশ বছরের এক ভারতীয় তরুণ সন্ন্যাসী আমেরিকার চিকাগো-ধর্মমহাসভায় দাঁড়িয়ে উঠে, সকলকে 'আমার ভাই ও বোন' বলে ডাক দিলেন, তখন থেকে যেন ভারত-ইতিহাসের রথের চাকায় আবার বেগ এল। ভারতের ঐ তরুণ সন্ন্যাসীর নাম স্বামী বিবেকানন্দ। পরাধীন দেশের মানুষ হয়েও তিনি ছিলেন বীরেশ্বর। সিংহের মতো দাঁড়িয়ে তিনি ভারতের সভ্যতার

মহিমার কথা বলেছিলেন। শ্রাবণের বর্ষাধারার মতো তাঁর কণ্ঠ থেকে শক্তির ও শান্তির বাণী বর্ষিত হয়েছিল। আমেরিকা দেখেছিল নরদেহে দিব্য আবির্ভাবকে। সে সংবাদ ছড়িয়ে পড়েছিল পৃথিবীর নানা দিকে, ইংলণ্ডেও।

সন্ন্যাসী ইংলণ্ডেও এসেছিলেন। যে-ইংরেজ তাঁর মাতৃভূমিকে পরাধীন করে রেখেছে তাদের দেশে তিনি এলেন কেন? ভিক্ষা করতে?

না—ধর্মপ্রচার করতে।

স্বামীজী বললেন, ইতিহাসে দেখা যায়, পরাধীন দেশ থেকে ধর্মের বন্যা উঠে ভাসিয়ে দিয়েছে শাসকদের দেশকে। তাই যে-ইংলণ্ড ভারতকে শৃঙ্খলিত করে রেখেছে তার উদ্দেশ্যে এনেছি ধর্মের বাণী।

স্বামীজী বললেন, ইংলণ্ড, তুমি আমাকে মারছ। কিন্তু কেউ কি সত্যই আমাকে মারতে পারে? ভারতবর্ষ বলেছে, মানুষের আত্মাকে মারা যায় না। যদি কেউ সত্যই সেকথা অনুভব করে তার মৃত্যুভয় থাকে না। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই ঐ আত্মা আছে। ঐ যে খ্রীস্ট আর বুদ্ধের কথা বলো, ওঁরা আমি, ওঁরা তুমি; তোমার আমার ভিতর থেকে ওঁরা উঠেছেন! আমরা সবাই মিলে এক মহাসাগর। তারই একটি বড় ঢেউ—খ্রীস্ট, আর একটি বড় ঢেউ—বুদ্ধ, তার বেশী কিছু নয়। আমরা কেউ বড় ঢেউ, কেউ ছোট ঢেউ। আমাদের নিয়েই আত্মার মহাসমুদ্র।

এ কী শুনি! এ কী শুনি! মার্গারেটের মনে হয়—আমার জীবনে মহামানব তাহলে সত্যই এতদিনে এলেন! দিকে দিকে এই তো রোমাঞ্চ লাগে। 'সুরলোকে বাজে জয়শঙ্খ, নরলোকে বাজে জয়ডঙ্ক।'

মার্গারেট অনুভব করেন—তাঁর মহাজন্মের লগ্ন এসেছে।

কয়েক মাস পরে স্বামীজী আমেরিকায় ফিরে গেলেন। পরের

বছর আবার এলেন।

বিস্ময়ের চমক কাটিয়ে উঠে মার্গারেট তন্নতন্ন করে যাচিয়ে নিতে চান স্বামীজীর প্রতিটি কথাকে। মার্গারেট যুক্তিবাদী; অসীম বুদ্ধিমতী। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে যান স্বামীজীকে। কোনো কিছুই বিনা পরীক্ষায় তিনি মেনে নেবার পাত্রী নন।

মহাপ্রতিভার অধিকারী স্বামী বিবেকানন্দ—মার্গারেটের সব প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিয়ে যান। স্বামীজীর বুদ্ধির কাছে মার্গারেট হার মানেন।

তার উপরে, স্বামীজীকে ঘিরে অপরূপ ধর্মের আলো, সে-জিনিস মার্গারেট আগে কখনো দেখেননি।

গুরু! আমার গুরু! স্বামীজীর চরণে তাঁর মনপ্রাণ লুটিয়ে পড়ে!

'একটি নমস্কারে প্রভু, একটি নমস্কারে!'

॥ ৫ ॥

এতদিনে মার্গারেট অন্তরে শান্তি পেলেন। এতদিনে দেখলেন, যা তিনি কল্পনা করে এসেছেন তা সত্যসত্যই কোনো মানুষের মধ্যে জীবন্ত রূপ ধরতে পারে। স্বামীজী ফিরে গেছেন নিজের দেশে—ধর্মের দেশ ভারতবর্ষে। সে দেশে কি মার্গারেট যেতে পারেন না?

ভারতই আমার দেশ—তাঁর মন গেয়ে ওঠে। আমি যাব সব ছেড়ে দিয়ে ভারতবর্ষে। গুরুর কাছে অনুমতি ভিক্ষা করেন।

অনুমতি মেলে না সহজে। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে স্বামীজীর মনে একটা বড় বেদনার স্থান ছিল। ভারত দুঃখী দেশ! কত শতাব্দীর অপমানের বোঝা তার উপর চাপানো। নতুন অপমান স্বামীজী

আর চান না। তাঁকে দেখে এই-যে ইংরেজ মেয়েটি মুগ্ধ হয়েছে, এ তো শাসক জাতিরই একজন। ভারতে এসে যখন সে দারিদ্র্যের আর অশিক্ষার চেহারা দেখবে, উল্টোদিকে দেখবে শাসক ইংরেজদের বিলাস-বাসনের রূপ, তখন সে কি আর নিরন্ন হতভাগাদের দলে থাকবে? সে তো সহজেই চলে যাবে ঐশ্বর্যের দরবারে। সে তো আরও ঘৃণা করবে ভারতকে। দরকার কি সে অপমান টেনে আনার!

বেদনার্ত বিবেকানন্দ বলেন, না মার্গট, তোমার এসে কাজ নেই।

অপরদিকে স্বামীজীর দিব্যনয়নে ভেসে ওঠে ভবিষ্যতের ছবি। মেয়ে তো নয়, যেন সিংহিনী। ওর শরীরে আছে কেল্টিক রক্তের তেজ। ওর মধ্যে বিদ্রোহ আছে, তপস্যা আছে, ভালবাসা আছে। এমন মেয়ে ভারতে নেই। ভারতের চাই শক্তিময়ী নারী। স্বদেশে তা যদি না থাকে, ধার করতে হবে বিদেশ থেকে। ও মেয়ে ভারতের সেবিকা, বান্ধবী, মাতা হবার যোগ্য। এখনো ওর ভিতরের সবটুকু জাগেনি। তাকে জাগালে ভারত জাগবে।

মেঘগম্ভীর কণ্ঠে নিবেদিতাকে ডাক দিয়ে স্বামীজী লেখেন:

"কুসংস্কারের শৃঙ্খলে আবদ্ধ এই পৃথিবী। এ জগৎকে আলো দেবে কে? জগতে যাঁরা সবচেয়ে সাহসী আর শ্রেষ্ঠ, তাঁদের চিরদিন বহুজনের হিতের জন্য, বহুজনের সুখের জন্য আত্মবিসর্জন দিতে হবে। অনন্ত প্রেম ও করুণা বুকে নিয়ে শত-শত বুদ্ধের আবির্ভাব প্রয়োজন।

জগতের এখন প্রয়োজন—চরিত্র। জগৎ এখন তাঁদের চায় যাঁদের জীবন প্রেমদীপ্ত ও স্বার্থশূন্য।

তোমার মধ্যে আছে জগৎ-আলোড়নকারী শক্তি। আমরা চাই জ্বালাময়ী বাণী, তারও চেয়ে—জ্বালাময় কর্ম। হে মহাপ্রাণ!

ওঠো, জাগো! জগৎ দুঃখে পুড়ে খাক্ হয়ে যাচ্ছে, তোমার কি নিদ্রা সাজে?

তোমাকে খোলাখুলি বলছি, ভারতের কাজে তোমার বিরাট ভবিষ্যৎ রয়েছে। তুমি ঠিক সেই নারী যাকে আজ প্রয়োজন।

কিন্তু বিঘ্নও আছে। এদেশের দুঃখ, কুসংস্কার, দাসত্ব প্রভৃতি কী ধরনের, তা তুমি ধারণা করতে পারবে না। এদেশে এলে তুমি নিজেকে অর্ধ-উলঙ্গ অসংখ্য নরনারীতে পরিবেষ্টিত দেখবে। অপরদিকে শ্বেতাঙ্গরা তোমাকে খেয়ালী মনে করে তোমার প্রতিটি গতিবিধিকে সন্দেহের চোখে দেখবে।

ঝাঁপ দেবার আগে বিশেষভাবে চিন্তা করো। কাজে যদি বিফল হও, কিংবা যদি বিরক্তি আসে, তবে আমার দিক থেকে নিশ্চয় জেনো, আমাকে আমরণ তোমার পাশে পাবে, তা তুমি ভারতবর্ষের জন্য কাজ করো আর নাই করো, বেদান্ত-ধর্ম রাখো বা ত্যাগ করো। মরদ্‌কী বাত্—হাতীকা দাঁত।"

সবাই শুনে হতবাক্। মার্গারেট চলে যাবে দেশ ছেড়ে! এমন যার প্রতিভা, এমন যার প্রভাব, যার সামনে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, লণ্ডনের মতো বিরাট শহরেও তরুণ বয়সেই যে দাগ কেটে বসেছে, সে চলে যাবে সাপ বাঘ আর ভুতুড়ে মানুষে ভর্তি ভারতবর্ষে!! মার্গারেট কি বেড়াতে যাচ্ছে? না, তা তো নয়! সে যাচ্ছে এক হিন্দু সন্ন্যাসীর শিষ্যা হয়ে ভারতবর্ষে, শিক্ষাদানের কাজ নিয়ে। কী কাণ্ড! হায়! হায়!

সবাই হায় হায় করে। মার্গারেট কিন্তু আশার আলোয় ভরপুর। তবু কি বুকে ব্যথা লাগে না—মনে জাগে না চিন্তা, ভাবনা আর সংশয়! ভাই, বোন, মা—এদের ছেড়ে যেতে হবে। আরও কত প্রিয়জন। ছেড়ে যেতে হবে ইংলণ্ড, আয়ারল্যাণ্ড—যার প্রতিটি ধূলিকণার সঙ্গে জড়িয়ে আছে এতগুলি বছরের স্মৃতি। এই দেশেরই

মাটি-জল-বাতাস থেকে রস নিয়ে সঞ্জীবিত হয়েছে স্নায়ু-শিরা, এরই পতাকার তলায় গর্বে-গৌরবে উচ্ছ্বসিত হয়েছে মনপ্রাণ; এই দেশ—আমার পিতৃভূমি—একে ছেড়ে যাব?

স্বামীজীর একটি কথা তাঁর মনে পড়ল—

'প্রয়োজন হলে, বুদ্ধদেব যেমন বলতেন তেমনি করে বহুজনের হিতের জন্য, বহুজনের সুখের জন্য আমি নিজ হস্তে নিজের হৃৎপিণ্ডকে উপড়ে ফেলতে পারি।'

আমি স্বামীজীর শিষ্যা—আমি পারব না কেন?—মার্গারেট ভাবেন।

সবচেয়ে বড় বাধা যেখান থেকে আসার কথা সেখান থেকে কোনো বাধাই এল না দেখে মার্গারেট দারুণ বিস্মিত হলেন। আশ্চর্য, বিধবা দুঃখিনী মা তাঁর প্রথম সন্তানটিকে অজানা পথে পা বাড়াতে দেখেও বাধা দিলেন না! মা আমার ইংরাজ বীর-রমণী, মার্গারেট হয়ত ভাবলেন, কিংবা ভাবলেন, বাবার অন্তিম ইচ্ছার জন্যই মা বাধা দিচ্ছেন না। কিন্তু কিছু জিজ্ঞাসা করলেন না এ-বিষয়ে! শুধু গভীর কৃতজ্ঞতায় ভরে গেল মন তাঁর।

না, এর কোনোটাই মায়ের বাধা না-দেবার আসল কারণ নয়। ভিতরে একটি ছোট্ট কাহিনী আছে, যেটি বাইরের একজন ছাড়া আর কেউ জানত না। মার্গারেটের মা যখন প্রথম সন্তান-সম্ভবা হন, বড় ভয় পেয়েছিলেন। ব্যাকুলভাবে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, 'ওগো প্রভু! কল্যাণ করো, রক্ষা করো! আমার এই প্রথম সন্তান, নির্বিঘ্নে ভূমিষ্ঠ হোক। তা যদি ঘটে, তাকে আমি তোমারই উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করব।'

মার্গারেট নির্বিঘ্নে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন।

তাই মার্গারেট যখন তাঁর মাকে বললেন, আমার গুরুর ডাক এসেছে, আমি ভারতে যেতে চাই, তখন মা বুঝলেন, এ হল ভগবানের

ডাক, তাঁর কাছে সঁপে-দেওয়া প্রাণটিকে নিয়ে নেবার জন্য।

মা বাধা দিলেন না। নমস্কার করলেন ঈশ্বরকে।

॥ ৬ ॥

ইংলণ্ড হারিয়ে গেল ধীরে-ধীরে চোখের সামনে। জাহাজঘাটায় যাঁরা এসেছিলেন—মা, ভাই, বোন, বন্ধুরা—সবাই দৃষ্টির অগোচরে চলে গেল। বিশাল সমুদ্রের উপরে দিন ফুরালো, রাত ঘনালো, ধ্রুবতারকা স্থির হয়ে জ্বলতে লাগল আকাশে। আর দিনে-রাত্রে সমুদ্রের নীল-নীল তরঙ্গ। মার্গারেটের মনের উপর দিয়ে সবকিছু বয়ে গিয়ে অবশেষে একদিন তাঁকে পৌঁছে দিল এক নূতন দেশে, যার নাম ভারতবর্ষ।

সে দিনটি ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারি।

স্বামীজী এসেছিলেন কলকাতার বন্দরে অভ্যর্থনার জন্য। মার্গারেটকে তিনি পৌঁছে দিয়ে গেলেন চৌরঙ্গীর এক হোটেলে। এখনকার মতো চৌরঙ্গী অঞ্চলেই তিনি থাকবেন। হয় হোটেলে, না-হয় কোনো বাড়িতে।

ভারতবর্ষকে জানবার জন্য গাড়িতে করে কলকাতার নানাপথে তাঁর ভ্রমণ শুরু হয়। কত কি দেখেন, ছবির মতো চোখের উপর দিয়ে সরে যায় সেগুলি। ভাল আর মন্দ, পছন্দ আর অপছন্দের জিনিস। মার্গারেট নির্নিমেষ চেয়ে থাকেন।

কিন্তু চোখে দেখা কতটুকু দেখা, মনে দেখাই বড় দেখা। ভারতবর্ষকে বাইরে থেকে দেখলে দীন দরিদ্র কুশ্রী মনে হয়, কিন্তু তার প্রাণের ভিতরে আছে সৌন্দর্য। তাকেই দেখতে হবে মার্গারেটকে। স্বামীজী তারই ব্যবস্থা করে দেন।
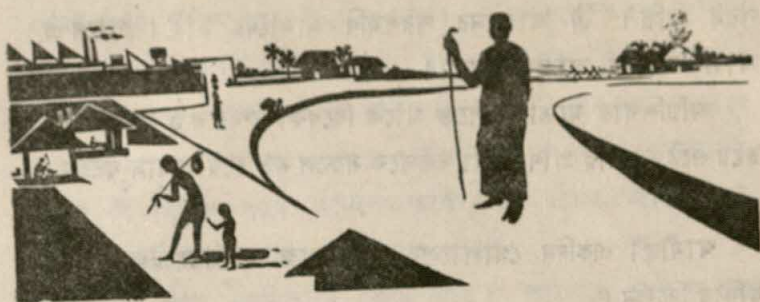
মার্গারেট আসবার কয়েকদিনের মধ্যে মিসেস ওলি বুল ও মিস ম্যাকলাউড ভারতে এসেছিলেন। এঁরা স্বামীজীর অনুরাগী আমেরিকান ভক্ত। মিসেস ওলি বুল ছিলেন নরওয়ের বিশ্ববিখ্যাত বেহালাবাদকের পত্নী। মিস ম্যাকলাউড অভিজাত পরিবারের মেয়ে। স্বামীজীর কাজে ও ধ্যানে এঁদের জীবন ছিল পূর্ণ।

বেলুড়ে গঙ্গাতীরে একটি ছোট বাড়িকে মিসেস ওলি বুল সাজিয়ে-গুছিয়ে নিলেন। মার্গারেট এই বাড়িতেই আশ্রয় পেলেন।

স্বামীজী সেখানে মাঝে-মাঝে আসতেন। তিনি এলে যেন দিব্যক্ষণের উদয় হত। একদিন তিনি কথা বলছেন গঙ্গাতীরে বসে, তখন বিকালের শেষ, এমন সময়ে হঠাৎ মেঘ এল ধেয়ে, আকাশ কালো হয়ে গেল, গঙ্গার রূপালী জলের উপরে ছায়া ছড়ালো, সাঁ-সাঁ শব্দ উঠল, ঝেঁকে উঠল গাছের মাথা, ফুলে উঠল জলরাশি—সকলে ত্রস্ত হয়ে উঠে এলেন ঘরের মধ্যে। বাইরে তখন বৃষ্টি নেমেছে, ক্রুদ্ধ পশুর লেজের মতো আছড়াচ্ছে ঝড়, বিদ্যুতের তরবারি ঝলসে-ঝলসে উঠছে, কড়কড় করে বজ্রের দামামা বাজছে ক্ষণে ক্ষণে—ঠিক সেই-সময়ে ঘরের ভিতরে বাতাসে কেঁপে-কেঁপে ওঠা আলোর সামনে একদিক থেকে অন্যদিকে পায়চারি করছেন মহাপুরুষ। তিনি বলছেন ভগবানের প্রতি মানুষের ভালবাসার কথা।—ভগবানকে ভালবাসো। তিনি প্রাণের প্রাণ, আত্মার আত্মা, তিনি পরম সত্য,

পরম অগ্নি। ঐ আগুনের পরশমণি আমাদের চাই। প্রাণে ঐ আগুন জ্বালো, আগুন জ্বালো!

অগ্নিশিখার মতো জ্বলতে থাকে বিবেকানন্দের কণ্ঠ। অগ্নিময় হয়ে ওঠে সকলের প্রাণ। অগ্নিস্বরূপকে সকলে নত হয়ে প্রণাম করেন।

স্বামীজী একদিন গোপালের মার সঙ্গে মার্গারেটের পরিচয় করিয়ে দিলেন।

বাইরে থেকে দেখলে গোপালের মা কালো মতন থুত্থুড়ি এক বুড়ি। ভারি ছুঁই-ছুঁই বাতিক। কিন্তু তাঁর প্রাণের ভিতরটা আলোয় ভরা। সে প্রাণে রয়েছে একটি মন্দির, তার ভিতরে আসন আর বিছানা পাতা। সেই আসনে ছোট্ট গোপাল-কৃষ্ণ এসে বসেন, সেই বিছানায় তিনি শুয়ে পড়েন, আর খেলা করেন মন্দিরের নানাস্থানে।

পরিচয় করিয়ে দেওয়া-মাত্র গোপালের মা মার্গারেটের চিবুক ধরে চুমু খেয়ে বললেন, 'ওমা, তুমিই নরেনের মেম-মেয়ে! বেঁচে থাকো বাছা, বেঁচে থাকো! গোপাল তোমার ভাল করুক।'

গোপালের মার অপরূপ কাহিনী শুনলেন মার্গারেট।—

তাঁর ভাল নাম অঘোরমণি। খুব অল্পবয়সে বিধবা হয়েছিলেন। বড় গরীব। জপে আর পূজায় দিনরাতের বেশী সময় কাটে। যখন তাঁর বয়স ষাট, একদিন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখতে গেলেন। গোড়া থেকেই কী-এক টান বোধ করলেন তাঁর প্রতি। দু'একদিন কাটতে না কাটতেই আবার হাজির হলেন ঠাকুরের কাছে। সঙ্গে নিয়ে গেলেন দু'এক পয়সার খুব কম দামের সন্দেশ। সে এত সামান্য যে লুকিয়ে রেখেছেন আঁচলের তলায়। ঠাকুরের কি ভাব হল কে জানে, সঙ্গে-সঙ্গে বললেন, 'কি এনেছ খেতে দাও।' বড় লজ্জায় সেগুলি বের করে দিতে হল তাঁকে। এর পরে

যখনই যান, ঠাকুর কেবলই খেতে চান। বুড়ির আনন্দ হয়, আবার রাগও হয়।—'এ কি রকম সাধু গো, খালি খাই-খাই করে! আমি গরীব কাঙাল লোক, এত খাওয়াবো কি করে?' তবু তিনি আবার আসেন, না এসে পারেন না, আর সামান্য যে-রান্না সঙ্গে করে আনেন, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরম আনন্দে তাই খেয়ে বলেন, 'আহা, সুধা, সুধা!' শুনে অঘোরমণির চোখে জল আসে।

কয়েক মাস এমনিভাবে কেটে যায়। তারপরে সেই অবাক ব্যাপারটি ঘটল। রাত তিনটেয়, চারদিক যখন নিঝুম, শুধু গঙ্গার কুলুকুলু শব্দ, অঘোরমণি ঘুম থেকে উঠে জপে বসেছেন, এমন সময়ে হঠাৎ দেখেন, ঠাকুর রামকৃষ্ণ সামনে বসে! একি কাণ্ড! উনি কোথা থেকে এলেন এমন সময়ে! চোখের ভুল নয় তো! না, ঐ তো তিনি বসে! অঘোরমণি সত্যি-মিথ্যে পরখ করবার জন্য সাহস করে যেই এগিয়ে তাঁর হাত ধরেছেন, অমনি ঠাকুর হারিয়ে গেলেন, আর তার জায়গায় দশ মাসের শিশু গোপাল-কৃষ্ণ। অ্যা-তো বড় গোপাল, হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে এসে আধো-আধো গলায় বলল, 'মা, ননী দাও!' অঘোরমণির পাগল হবার উপক্রম। যে গোপালকে এতদিন ধরে পুজো করে আসছেন, ডেকে-ডেকে অস্থির, সেই গোপাল তাহলে সত্যি এল! আবার খেতে চায়! অঘোরমণির বুক চিরে কান্না বেরিয়ে আসে—'বাবা, আমি দুখিনী কাঙালিনী, আমি তোমায় কি খাওয়াব, ননী ক্ষীর কোথায় পাব বাবা?' দুষ্টু গোপাল-ছেলে শুনবে কেন? কেবলই বলে, 'খেতে দাও, খেতে দাও!' অঘোরমণি কি করেন, শুকনো নারকেল নাড়ু ছিল, তাই হাতে তুলে দিয়ে কেঁদে বলেন, 'বাবা, তুমি গোপাল; আমি এমনই অভাগী যে এইসব তুচ্ছ জিনিস তোমাকে খেতে দিলুম।'

এরপর জপ-তপ অঘোরমণির মাথায় উঠল। গোপাল তাঁকে একদম ছাড়ে না। কেবলই কোলে এসে বসে, হাতের মালা কেড়ে নেয়, কাঁধে চড়ে; তারপর ঘরময় ছুটে বেড়ায়। সকাল হলে

অঘোরমণি পাগলিনীর মতো ছুটে চললেন দক্ষিণেশ্বরের দিকে। গোপালও তৎক্ষণাৎ কোলে উঠে পড়ল। কাঁধে মাথা হেলিয়ে রাখল। বুড়ির বুকের কাছে দুলতে লাগল গোপালের রাঙা টুকটুকে পা দুখানি।

ঠাকুরের কাছে যখন অঘোরমণি গেলেন, সকলে তাঁর অবস্থা দেখে অবাক। এলোমেলো পাগলের অবস্থা, ধুলোয় লুটোচ্ছে আঁচল, কিছুতে যেন হুঁশ নেই, দু'চোখ বেয়ে দরদর ঝরছে জল।

অঘোরমণি যেই ঠাকুরের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন, অমনি গোপাল ঠাকুরের মধ্যে ঢুকে গেল। তখন তিনি যা-কিছু ক্ষীর ননী কোনো-ক্রমে জোগাড় করে এনেছিলেন, তাই খাওয়াতে লাগলেন ঠাকুরকে, যেমন করে মা খাইয়ে দেয় শিশুকে। ঠাকুরও দিব্যি ছোট ছেলের মতো খেতে লাগলেন।

অঘোরমণি যখন আবার বাড়ি ফেরার পথ ধরলেন, তখন ছোট্ট গোপাল আগের মতো হাজির। আবার গোপালকে তিনি বুকে তুলে নেন, আবার তার রাঙা পা দোলে বুকের মাঝখানটিতে।

এইভাবে গোপাল-কৃষ্ণকে পাওয়ার জন্য অঘোরমণির নাম হয়ে যায় গোপালের মা। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে মায়ের মতো দেখতেন।

মার্গারেট গোপালের মাকে দেখলেন, তাঁর কথা শুনলেন। ভারতবর্ষের একটি ঠাকুরঘরের দরজা যেন তাঁর কাছে খুলে গেল।

মার্গারেট গেলেন সেই পরমাশ্চর্য নারীর কাছে যিনি স্বয়ং ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণী হবার ভাগ্য করেছিলেন। সারদামণি নাম। পাঁচ বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল ঠাকুরের সঙ্গে। ঠাকুর তখন ভগবানকে পাবার জন্য পাগল। বাইরে থেকে দেখলে পাগল বলেই মনে হত। তাই সবাই বলত সারদার বিয়ে হয়েছে পাগলের সঙ্গে। শুনে সারদার চোখ দিয়ে জল পড়ত। স্বামীর অপমানে তিনি ব্যথা পেতেন। তিনি তো জানতেন মহাভাগ্য তাঁর। জগতের কাছে শিব পাগল কিন্তু উমার কাছে শিব প্রেমে পাগল। সারদা অন্তরে বুঝেছিলেন তাঁর স্বামী ভগবানের প্রেমে পাগল। যখন বয়স বাড়ল, একদিন চলে এলেন গাঁয়ের বাড়ি থেকে দক্ষিণেশ্বরে। শ্রীরামকৃষ্ণ সেখানে সাধনায় মগ্ন। ঠাকুর তাঁকে বললেন, আমি সন্ন্যাসী, সংসারী নই; তবে তুমি আমার স্ত্রী; তুমি যদি বলো সংসারে ঢুকতে, আমি তা করব। সেকথা শুনে সারদা তাঁর স্বচ্ছ আলোভরা গলায় বললেন, সে কী! আমি যে তোমার সহধর্মিণী, তোমার ধর্মই তো আমার ধর্ম। তোমার ধর্ম তুমি পালন করো, আর আমাকে শিষ্যা করে নাও। ঠাকুর শুনে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। সারদাকে পূজার আসনে বসিয়ে পূজা করলেন। বললেন, এ আমার আনন্দময়ী। এ যদি আনন্দে থাকে, আমার সব আনন্দ। সারদা দক্ষিণেশ্বরে থেকে গেলেন, আর ঠাকুরের জীবন ভরিয়ে দিলেন নিঃশব্দ সেবায়। তাঁর সবই নিঃশব্দ, তপস্যাও। গভীর রাতে, সবাই যখন ঘুমিয়ে, ভরা পূর্ণিমার চাঁদের দিকে চোখ মেলে বলেছেন, 'ঐ চাঁদের আলোর মতো যেন নির্মল হয় আমার অন্তর।'

ম্যাকলাউড, মিসেস বুল বা মার্গারেট—এঁরাই প্রথম ইউরোপীয় মহিলা যাঁরা সারদাদেবীর সাক্ষাৎ পান। ব্রাহ্মণঘরের মেয়ে তিনি। তখনকার দিনে আচার-বিচার খুব কঠোর ছিল। ইউরোপীয়দের অশুচি মনে ক'রে, তাঁদের ছোঁয়া এড়িয়ে যাওয়া হত, ভিতরের ঘরে ঢুকতেও দেওয়া হত না। সেই যুগে সারদাদেবীর মতো গোঁড়া

ব্রাহ্মণকন্যা বিদেশিনী মহিলাদের সঙ্গে যখন একসঙ্গে বসে খেলেন, তখন তাঁর সাহস আর মনের উদারতায় সবাই অবাক হয়ে গেল। এ-জিনিস সারদাদেবীর পক্ষেই করা সম্ভব, কারণ তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের পত্নী, যাঁর কাছে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীস্টান সব ধর্মই সমান সত্য। তাছাড়া সারদামণি ছিলেন সকলের 'মা'—মায়ের কাছে সন্তানের জাতিভেদ থাকে না।

আরও অবাক কাণ্ড, সারদাদেবী বিদেশিনী মার্গারেটকে নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিলেন, সেজন্য প্রতিবেশীরা কত নিন্দা করল তাঁর।

মার্গারেটের মনে হত, শ্রীমা সারদার ঘরটি যেন শান্তিমন্দির। তার সমস্তটাই পূজায় ভরা। ভোরের আলো ফোটার অনেক আগেই শ্রীমার সঙ্গিনীরা বিছানা ছেড়ে উঠে পড়েন; নিঃশব্দে চাদর বালিশ সরিয়ে মাদুরের উপরে জপ করতে বসে যান। মুখ ঘোরানো থাকে দেওয়ালের দিকে। হাতের মালা ঘুরতে থাকে। তারপরে সকাল হয়। তখন পূজার আয়োজন, নৈবেদ্য সাজানো, ধূপ-দীপ জ্বালানো, মৃদুকণ্ঠে মন্ত্র-পাঠ। তারপরে দুপুরের আহার-শেষে বিশ্রাম। বিকেল গড়িয়ে আসে, গোধূলির পরে সন্ধ্যা নামে, ঘরে-ঘরে তুলসীমঞ্চে প্রদীপ জ্বালায় বধূরা, প্রণাম করে গলায় কাপড় দিয়ে, শাঁখ ঘণ্টার শব্দে ভরে যায় পল্লী। সেই সময়ে সারদা উঠে গিয়ে তুলসীতলার কাছে বসেন। ধ্যানে ডুবে যান তারপরেই। মার্গারেট তাঁর পাশে বসে অতল চোখে তাকিয়ে থাকেন। মনে হয়, তাঁর সৌভাগ্যের সীমা নেই—শ্রীমার পাশে এমন সময়ে বসতে পেয়েছেন। দেখেন, আকাশে তারা ফুটেছে, চাঁদ উঠে আলো ছড়িয়েছে কোমল ভালবাসার মতো। মার্গারেটের মনে হয়, এই সবকিছুই শ্রীমায়ের সান্নিধ্যের মতো। তিনি যখন পূজার আসনে বসেন, তখন সেরা একখানি গান যেন মূর্তি ধরে বসে থাকে স্তব্ধ হয়ে।

সারদাদেবী ভারতীয় নারীর চির আদর্শের প্রতিমা। তাঁর হাত ধরে মার্গারেট ভারতের অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন।

স্বামীজীকে মার্গারেট দেখেছেন, সারদাদেবীকে দেখেছেন, গোপালের মাকেও, কিন্তু এঁদের মাঝখানে যিনি বিরাজ করছেন তাঁকে সামনাসামনি দেখার সৌভাগ্য হয়নি মার্গারেটের। সেই পরম মানুষটির নাম শ্রীরামকৃষ্ণ। মার্গারেট ভারতে আসার বারো বছর আগেই শ্রীরামকৃষ্ণ দেহত্যাগ করেছেন। তিনি নেই কিন্তু রয়েছে তাঁর কক্ষটি, যেখানে তিনি বছরের পর বছর কাটিয়েছেন ; রয়েছেন দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের দেবী ভবতারিণী—শ্রীরামকৃষ্ণের আরাধ্যা দেবী। দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে অবশ্য প্রবেশের অধিকার ছিল না বিদেশিনী মার্গারেটের, মন্দিরের কর্তারা এমনই গোঁড়া। সে বেদনাকে নীরবে সয়েছিলেন মার্গারেট। সমস্ত অন্তর ঢেলে প্রণাম করতেন ঠাকুরের ঘরের সামনে। চলে যেতেন পঞ্চবটীতে। বসতেন ধ্যানের আসনে। তেমনি একটি দিন, সে দিনটি ছিল জ্যোৎস্নায় ভরা। আকাশে আলোর প্লাবন। নীচে দুধ-ঢালা গঙ্গা। মার্গারেট বসে আছেন পঞ্চবটীর তলায়। আকাশ থেকে যেন আলোর বৃষ্টি হয়েছে ; গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে গলে-গলে পড়ছে আলোর ফোঁটা ; মার্গারেটের চারপাশে আলো-জলের আলপনা। তারই মাঝখানে বসে থাকেন তপস্বিনী শ্বেতাঙ্গিনী, রামকৃষ্ণ-তীর্থে।

মার্গারেটের জীবনের মহালগ্ন এল—যেদিন তিনি নতুন নাম পেলেন। স্বামীজী দীক্ষা দিয়ে তাঁর নব নামকরণ করলেন—নিবেদিতা! নাম তো নয়, মন্ত্র। নামটি অক্ষয় হয়ে থাকবে ভারতের ইতিহাসে।

শুধু 'নিবেদিতা' নামটিই নয়, একটি অনুপম কবিতাও স্বামীজী উৎসর্গ করেছিলেন শিষ্যার উদ্দেশ্যে। নিবেদিতার প্রতি কী গভীর শ্রদ্ধাই না প্রকাশ পেয়েছিল তাতে! স্বামীজী ঐ কবিতায় লিখেছিলেন : মহান যা-কিছু আছে সবই মিলিত হোক তোমার চরিত্রে। মায়ের হৃদয়ের চেয়ে বড় কিছু নেই, বীরের প্রতিজ্ঞার চেয়ে দৃঢ় কিছু নেই, বসন্তের বাতাসের চেয়ে মধুর কিছু নেই, যজ্ঞশিখার চেয়ে পবিত্র কিছু নেই—এ সবকিছুই একত্রিত হোক তোমার মধ্যে। এ সবের চেয়ে উচ্চ যদি কিছু থাকে, তাও জেগে উঠুক তোমার জীবনে।

স্বামীজী বললেন—

ভারতের ভবিষ্যৎ সন্তানের তরে
সেবিকা, বান্ধবী, গুরু—তুমি একাধারে।

॥ ৭ ॥

দীক্ষাদানের পরে নিবেদিতা, ওলি বুল, ম্যাকলাউড এবং আরও কয়েকজনকে নিয়ে স্বামীজী বেরিয়ে পড়লেন ভারততীর্থের পথে। উত্তর ভারত ঘুরে তাঁরা গেলেন কাশ্মীরে। কাশ্মীরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সীমা নেই। কাশ্মীর সত্যই ভূস্বর্গ। কাশ্মীরের শ্রীনগরে ঝিলম নদীর উপরে কয়েকটি নৌকায় তাঁরা থাকতেন। স্বামীজীর সঙ্গে প্রতিদিনই নিবেদিতাদের দেখা হত। ভারতীয় সভ্যতার মর্মকথা স্বামীজীর কাছ থেকে তাঁরা শুনতেন।

স্বামীজীর বিশাল মহিমাকেও নিবেদিতা দেখতে লাগলেন। মহারাজারা যাঁর পায়ে লুটিয়ে প্রণাম করেন, তিনি সামান্য মজুরকেও

বুকে জড়িয়ে ভালবাসেন! একদিকে তিনি হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠ আচার্য, অন্যদিকে সকল ধর্মের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা। যে-নৌকায় থাকতেন, তার মাঝি মুসলমান। তার ছোট মেয়েটিকে কত না ভালবাসতেন! মেয়েটিও স্বামীজীর কাছ-ছাড়া হতে চাইত না কখনো। হিন্দুরা নিষ্পাপ শিশুকন্যাকে দেবী উমা জ্ঞান ক'রে তার পূজা করে দুর্গাপূজার সময়ে। তাকে বলে কুমারী পূজা। স্বামীজী একদিন এই মেয়েটিকে তেমনি করেই পূজা করলেন।

কাশ্মীর হিমালয়ের কোলে। ভারতবর্ষের কাছে হিমালয় দেবভূমি। কাশ্মীরে রয়েছে হিমালয়ের এক সেরা তীর্থ অমরনাথ। স্বামীজী স্থির করলেন, নিবেদিতাকে নিয়ে অমরনাথে তীর্থ করতে যাবেন। সেখানে নিবেদিতাকে উৎসর্গ করে দেবেন শিবের কাছে।

শ্রীনগর থেকে যাত্রা শুরু হয়। দুর্গম পথ। বহু হাজার ফুট হেঁটে উঠতে হয়! অনেক জায়গায় পথ প্রায় নেই! কোথাও-বা মাইলের পর মাইল বরফে ঢাকা। এমনি পথে স্বামীজী চলেছেন তীর্থযাত্রীদের দলে—বিদেশিনী কন্যাটিকে সঙ্গে নিয়ে।

পাহাড়ে পথে ওঠা ক্রমেই বেশী কষ্টকর হয়ে ওঠে। হাঁপাতে-হাঁপাতে সবাই এগোয় সাবধানে। কখনো পা টিপে-টিপে, কখনো গুঁড়ি মেরে, কখনো সন্তর্পণে পাথরের দেওয়াল ধরে-ধরে। নীচে গভীর খাদ। একটুকু পা ফসকালেই মৃত্যু।

এমন পথে হাঁটতে-হাঁটতে স্বামীজীর দেখা অনেক সময়ই নিবেদিতা পান না। সাধুর দলে তিনি যেন হারিয়ে গেছেন! কামানো মাথা, এক হাতে লাঠি, অন্য হাতে জপমালা। দিনে একবার মাত্র খান। প্রতিটি কুণ্ডে স্নান করেন। ঠোঁট কাঁপে সর্বদা মন্ত্রজপে।

অসীম পথের কষ্ট। যখন অমরনাথের গুহার কাছে পৌঁছেছেন, স্বামীজী মূর্ছিত হন বুঝি। সামলে নিয়ে স্নান করেন তুষারগলা জলে। পরণে শুধু কৌপীন, গায়ে ছাই। গিয়ে ঢুকলেন অমরনাথের গুহার মধ্যে।

সেখানে যা দেখলেন—কার সাধ্য আছে তার বর্ণনা করবে! স্বয়ং অমরনাথ প্রত্যক্ষ তাঁর সামনে! শিব! শিব! জ্যোতি শুধু জ্যোতি! শিব! শিব! অসহ্য আবেগে নিজেকে হারিয়ে ফেলেন বুঝি! লুটিয়ে প্রণাম করেন। শিব! শিব!
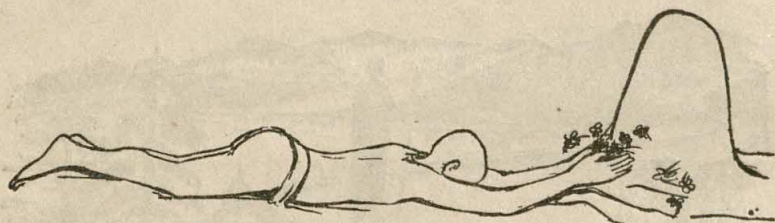
স্বামীজী যখন গুহার বাইরে এসে দাঁড়ালেন, নিবেদিতার মনে হল—সাক্ষাৎ ঈশ্বর!

নতজানু হয়ে নিবেদিতা বলেন, 'ঐ অনুভূতির অধিকার আমাকে দিন প্রভু!'

স্বর্গীয় হাসিতে ভরে যায় গুরুর মুখ। আশীর্বাদ করে বলেন, 'একদিন এই তীর্থযাত্রার ফল নিশ্চয় ফলবে একথা জেনো।'

শিবতীর্থ অমরনাথ থেকে শক্তিতীর্থ ক্ষীরভবানীতে স্বামীজী গেলেন একাকী। সেখানেও অপূর্ব দর্শন ঘটল। মাতৃভাবে ভরপুর হয়ে গেলেন।

এর আগেই, শ্রীনগরে থাকা কালেই, একদিন ধ্যানের চোখে মহা-কালীকে দেখে তাঁর দারুণ রূপকে ফুটিয়েছেন কবিতায়—স্বামীজীর সেই সেরা কবিতাটির নাম 'মৃত্যুরূপা মাতা'। সেই কবিতায় প্রলয়ঙ্করী ভয়ঙ্করী কালীর বর্ণনা আছে। মহাকালী যখন ধ্বংসের মাতনে থাকেন তখন নিভে যায় আকাশের সব তারা, মেঘের উপরে মেঘ আছড়ে পড়ে পাক খেয়ে, হাহাকার করে কাঁদে অন্ধকার, গর্জন করে ধেয়ে চলে ঝঞ্ঝা, উপড়ে উড়ে চলে বিশাল বৃক্ষ, ঝড়ের ধাক্কায় ফুঁসে ওঠে সমুদ্র, পর্বতের মতো ঢেউ প্রহার করে আকাশে। এই হল প্রলয়ের ছবি, মৃত্যুর ছবি, এরই নাম কালী।

"করালি ! করাল তোর নাম, মৃত্যু তোর নিশ্বাসে প্রশ্বাসে।
তোর ভীম চরণ নিক্ষেপ প্রতি পদে ব্রহ্মাণ্ড বিনাশে।
কালী তুই প্রলয়রূপিণী ! আয় মাগো আয় মোর পাশে।"

এমন কালীকে দর্শনের যোগ্য কে ? স্বামীজী বললেন—

"সাহসে যে দুঃখ দৈন্য চায়, মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে,
কালনৃত্য করে উপভোগ, মাতৃরূপা তারি কাছে আসে।"

নিবেদিতা এতদিন ধরে বহু মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে যে-সত্যের সন্ধান করেছিলেন, এবার তাকে পেলেন। মানুষ মৃত্যুকে ভয় পায় বলেই যতদিন বেঁচে থাকে ততদিন লোভীর মতো যা পায় তাকেই আঁকড়ে ধরে ভোগ করতে চায়। তাই সে কাউকে কিছু দিতে পারে না, তাই সে কাপুরুষ। কিন্তু যারা মৃত্যু বা এই কালীকে ভয় পায় না, তারাই হল কালীর ছেলে, তারা এগিয়ে যায় দুঃখ-দৈন্য-বিপদের মাঝখানে, ঝাঁপিয়ে পড়ে—দু'হাত বাড়িয়ে দেয় মৃত্যুকে আলিঙ্গনের জন্য।

॥ ৮ ॥

সেই মৃত্যু তার করাল চেহারা নিয়ে এসে গেছে কলকাতায়। প্লেগ এসেছে। প্লেগের তুল্য ভয়ঙ্কর মহামারী হয় না। মহারাষ্ট্রে এই প্লেগে লাখ-লাখ মানুষ মরেছে। এবার কলকাতা। প্লেগের কঙ্কাল-মুখের হাসি হা-হা ক'রে ছোটে কলকাতার পথে-পথে।

শীতল মৃত্যুর বাতাস বয়ে গেল। আতঙ্কে পাগল হাজার-হাজার লোক ছুটল ঘরবাড়ি ছেড়ে। পালাও! পালাও! তারা পালাতে থাকে, আর পিছন ফিরে দেখে—বুঝি কঙ্কাল-হাতের আঙুলগুলো সাঁড়াশীর মতো গলার নালী চেপে ধরেছে!

এই তো মৃত্যু! কোথায় কালীর ছেলের দল, যারা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করবে? কোথায় বিবেকানন্দের ভক্তেরা—কোথায় নিবেদিতা?

স্বামীজীর সঙ্গে আলমোড়া ও অমরনাথে যাওয়ার আগেই নিবেদিতা কলকাতায় দুটি বক্তৃতা করেছিলেন কালী-সাধনার বিষয়ে। একটি বক্তৃতা হয় অ্যালবার্ট হলে, অন্যটি কালীঘাট মন্দিরে। বক্তৃতা দুটি শহরে দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। সাহেবরা কালীপূজার নিন্দায় পঞ্চমুখ; তাদের নকলে অনেক ভারতবাসীও। এমন অবস্থায়, একজন ইংরাজ মহিলা কালীপূজার উপরে বক্তৃতা করছেন—এতে স্বভাবতই নিন্দা ও প্রশংসার ঝড় উঠেছিল শহরে।

বক্তৃতা দুটিতে কালী-সাধনার বিষয়ে নিবেদিতা যে-সব কথা বলেছেন—তাঁর গুরু বিবেকানন্দ মৃত্যুর বিষয়ে যে-সব তত্ত্বকথা বলে থাকেন—এবার দেখাই যাক সেগুলিকে তাঁরা কতদূর কাজে পরিণত করতে পারেন এই প্লেগ-শ্মশানের মধ্যে! সবাই প্রতীক্ষা করে।

কলকাতার ক্লাসিক থিয়েটারে বক্তৃতার আয়োজন হয়েছে। সভাপতি স্বামী বিবেকানন্দ। বক্তৃতা দেবেন ভগিনী নিবেদিতা।

কালীঘাট মন্দিরে নিবেদিতা বক্তৃতা করলেন

বিষয়—প্লেগ ও কলকাতার ছাত্রসমাজ। ছাত্ররা এসেছে দলে-দলে।

স্বামীজী বলতে উঠলেন। শরীর অসুস্থ। দাঁড়াতে কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু তারপরেই যেন বদলে গেলেন। জ্বলতে লাগল কণ্ঠ। বললেন—

'তোমরা কি মানুষ? তা যদি হতে, তাহলে যখন তোমাদের আত্মীয়রা, তোমাদের দেশের মানুষরা মরছে, তখন চুপ করে বসে থাকতে না। তোমাদের বিরুদ্ধে নিন্দে ক'রে সাহেবরা যে-কথা বলেছে, সেগুলিই ঠিক কথা। যদি মনে করো, সেগুলি ঠিক নয়, সেগুলি মিথ্যে কথা—তাহলে তা প্রমাণ করতে তোমরা এগিয়ে এসো! কীটের মতো মানুষ মরছে—এসো তোমরা—বীরের মতো মরো!'

নিবেদিতা বললেন—

'প্লেগ নিবারণের ব্যাপারে সাহায্য করবার জন্য, মানুষ বলে নিজেকে মনে করে এমন প্রতিটি মানুষকে আমি ডাক দিচ্ছি। আজ ধর্মের আহ্বান বেজেছে, এসেছে কর্মের আহ্বান। শ্রেষ্ঠ পূজার অর্ঘ্য হল নিজেকে বলি দেওয়া। কলকাতার ছেলেরা! কতজন তোমরা পারো নিজেকে বলি দিতে? কতজন পারো তোমাদের বিশ্বাসকে আগুনের বিশ্বাসে, আগুনের নিঃশ্বাসে পরিণত করতে? এই শহরের এক প্রান্তে ধর্মের শ্রেষ্ঠ আচার্য শ্রীরামকৃষ্ণ থাকতেন। তিনি ব্রাহ্মণ-সন্তান। পাছে কেউ বাধা দেয়, রাত্রে গোপনে চলে যেতেন মেথরদের ঘরে, তাদের নর্দমা-পায়খানা পরিষ্কার করতেন নিজের মাথার চুলে…'

কলকাতা শহর তার জীবনের অপূর্ব দৃশ্য দেখল। ঝাড়ু-বালতি হাতে একটি বিচিত্র ঝাড়ুদার দল। সবাই ভদ্রসন্তান। তাঁদের সামনে আছেন এক শ্বেতাঙ্গিনী। তাঁরা চলেছেন বস্তী পরিষ্কার করতে নিজের হাতে। তাঁরা চলেছেন মুচি-মেথরের ঘরে—যারা 'আমার রক্ত, আমার ভাই।'

নিশীথ রাত্রির আর একটি দৃশ্য।

ঘরে-ঘরে কান্না উতরোল। হিংস্র ক্ষুধার্ত পশুর মতো প্লেগ খুঁজে ফিরছে শিকার। তার স্পর্শ হলেই মৃত্যু। বাগবাজারের বস্তীর একটি নোংরা কুটীরে প্লেগ তার আহার্য নিয়ে চলে গেছে: মা মরেছে; পড়ে আছে শিশুটি। তার গায়েও লেগেছে প্লেগের বিষশ্বাস। সেও মরবে। একদিন কি দু'দিন বড় জোর। শিশুটির কাছে বসে আছেন করুণাময়ী নারী দু'দিন ধরে। সবাই তাঁকে জীবনের ভয় দেখিয়ে নিষেধ করেছিল। তিনি শোনেননি। বসে আছেন একটানা। রাত্রি গভীর। চারিদিকে শ্মশানের স্তব্ধতা। কচিৎ কখনো জমাট নীরবতা ছিঁড়ে যাচ্ছে শবযাত্রীদের করুণ আর্তনাদে। শিশুটির মৃত্যু এখন আসন্ন। সে এবার তার মাকে চায়। ছোট হাত দিয়ে মায়ের ভালবাসাকে আঁকড়ে ধরতে চায়। এই তো—মা এসেছে! এই তো—মায়ের কোলে সে আছে! শেষ কষ্টে তার দেহ থরথর ক'রে উঠে স্থির হয়ে যায় মায়েরই কোলে।

মৃত শিশুকে কোলে নিয়ে বসে থাকেন লোকমাতা নিবেদিতা।

॥ ৯ ॥

দেড় বছর ভারতে কাটাবার পরে নিবেদিতা নিজের দেশের জাহাজ ধরলেন। ইতিমধ্যে তিনি কলকাতার নানা মহলে পরিচিত হয়েছেন। শিক্ষিতসমাজ তাঁকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করেছে; অনেক বড় পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়েছে। সেবা ও শিক্ষার ব্যাপারে তাঁর কাজের প্রশংসা সর্বত্র।

নিবেদিতার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবারের সঙ্গে। এই পরিবারের প্রধান পুরুষ, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অকুণ্ঠ স্নেহ তিনি পেয়েছিলেন। স্বামীজীর সঙ্গে একদিন নিবেদিতা মহর্ষির দর্শনেও গিয়েছিলেন। স্বামীজী ও তাঁর এই

কন্যাটিকে, মহর্ষি আশীর্বাদ করেছিলেন। ঠাকুর-পরিবারের অনেকেই সেই সম্মিলনে উপস্থিত ছিলেন।

এতসব বিশিষ্ট মানুষদের সঙ্গে পরিচয়—সেবা ও শিক্ষার কাজে ব্যস্ত থাকা—এই সবের জন্য নিবেদিতা ভারত ছেড়ে যাবার কথা ভাবতেই পারেননি, তবু তাঁকে যেতে হল, কারণ আর কিছু নয়, টাকার অভাব। নিবেদিতা পাশ্চাত্যে চলেছেন টাকার জোগাড় করতে।

ভারতে নারীদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্য স্বামীজী নিবেদিতাকে এদেশে এনেছিলেন। পুরুষ ও নারী মিলিয়ে দেশ। নারীরা জনসংখ্যার অর্ধেক! তারা যদি শিক্ষিত না হয়, জাগ্রত না হয়, তাহলে ভারতের উন্নতি হবে না। তাদের এমন শিক্ষা দিতে হবে, যাতে তারা একালের ভালো জিনিসগুলি নিতে পারে; অথচ দেখতে হবে, ভারতে অনেকদিন ধরে যে-সভ্যতার ধারা বয়ে আসছে, তার প্রভাব যেন নষ্ট না হয়। সেই ধরনের শিক্ষাদানের জন্য নিবেদিতা বাগবাজারে মেয়েদের বিদ্যালয় খুলে বসেছিলেন। বিদ্যালয়ের নাম—রামকৃষ্ণ বালিকা বিদ্যালয়। স্বয়ং সারদাদেবী এসে পূজা করে বিদ্যালয়ের সূচনা করে গিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'আমি প্রার্থনা করছি, এই বিদ্যালয়ের উপরে জগন্মাতার আশীর্বাদ বর্ষিত হোক। এখানকার মেয়েরা যেন আদর্শ বালিকা হয়।' স্বয়ং শ্রীমার কাছ থেকে এতবড় আশীর্বাদ পেয়ে নিবেদিতা নিজেকে ধন্য মনে করেছিলেন।

বিদ্যালয় স্থাপন তো হল—চলবে কি করে? আমেরিকায় বক্তৃতা করে স্বামীজী যা-কিছু টাকা এনেছিলেন, সব প্রায় খরচ হয়ে গেছে মঠ প্রতিষ্ঠায় ও সেবা-কাজে। স্বামীজীর সাধ্য নেই বিদ্যালয় চালানোর জন্য টাকা দেন। সাহায্য করতে কেউ এগিয়েও এল না। তখন স্বামীজী নিবেদিতাকে বললেন, 'বিদ্যালয় যদি চালাতে চাও, তার টাকার ব্যবস্থা তোমাকেই করে নিতে হবে।'

নিবেদিতা তাই চলেছেন পাশ্চাত্যে, টাকার চেষ্টায়।

দুঃখিত মনেই নিবেদিতা ইউরোপে যাওয়ার কথা ভাবছিলেন, এমন সময়ে তাঁর সব দুঃখ বিপুল আনন্দে পরিণত হল। স্বামীজী ইউরোপে যাচ্ছেন গুরুভাই তুরীয়ানন্দকে সঙ্গে করে। তিনি বললেন, নিবেদিতা একসঙ্গে যেতে পারেন। নিবেদিতা ভাবলেন, আমি ধন্য! গুরুর সঙ্গে ভ্রমণ হল তীর্থযাত্রা। ইতিপূর্বে হিমালয়ে তেমনি এক তীর্থ করে এসেছেন। কে জানত, সে সৌভাগ্য আবার ঘটবে!

জাহাজে স্বামীজীর কাছে যে-ক'টি দিন কাটিয়েছিলেন, নিবেদিতা তাকে জীবনের সেরা সময় মনে করতেন। স্বামীজীও সযত্নে তাঁকে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি জানতেন, এই নিবেদিতাই ভবিষ্যতে তাঁর বাণীকে পৌঁছে দেবেন সকল মানুষের কাছে। তাই নিবেদিতার শিক্ষার জন্য সবচেয়ে বেশী সময় তিনি দিয়েছেন। ভারতবর্ষে ভ্রমণের সময়ে স্বামীজী ভারতীয় জীবনের খুঁটিনাটি সব-কিছু নিবেদিতার কাছে খুলে ধরেছিলেন: চাষী, তাঁতী, কুমোর নিয়ে যে-ভারত—জেলে, মালা, মুচি, মেথরের যে-ভারত—অপরূপ কলা-শিল্পের যে-ভারত—সাহিত্য ও দর্শনের স্রষ্টা যে-ভারত। স্বামীজী দেখিয়েছিলেন ভারতের মহিমার রূপ, আবার দীনতার রূপ। ভারতের বীর যুগ ও ভারতের পতনের যুগ—কিছুই বাদ যায়নি। এবার যখন জাহাজে চলেছেন ভারত ছেড়ে ইউরোপের দিকে, তখন স্বামীজী খুলে ধরলেন বিশ্ব-ইতিহাসের তরঙ্গচ্ছবি। দেখিয়ে দিলেন, পৃথিবীর সভ্যতায় ভারতের দান কতখানি। নিবেদিতার সামনে উন্মোচিত হল সমগ্র মানব-সভ্যতার মহাগ্রন্থের পৃষ্ঠাগুলি একে-একে।

আমেরিকা ও ইউরোপে দেড় বছর কাটাবার পরে স্বামীজী দেশে ফিরে এলেন। নিবেদিতার সঙ্গে ইউরোপে বা আমেরিকায় মাঝে-মাঝে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছে। স্বামীজী তাঁকে শিক্ষা দিয়েছেন, আবার কাজের ব্যাপারে স্বাধীনতাও দিয়েছেন। স্বামীজী ভারতে ফিরে আসার পরেও নিবেদিতা পাশ্চাত্যদেশে রয়ে গেলেন সেই

কাজের জন্য। দুটি কাজ বড় করে নিয়েছিলেন। প্রথম, বিদ্যালয়ের জন্য টাকার জোগাড় করা, দ্বিতীয়, ভারতের আসল রূপ খুলে ধরা বিদেশের কাছে। ভারতবর্ষকে যারা পরাধীন করে রেখেছিল, কিংবা বাইরে থেকে এসে যারা ভারতবর্ষে নিজেদের ধর্মপ্রচার করতে চাইত, তারা ইউরোপ আমেরিকায় বলে বেড়াত—ভারত অসভ্য দেশ, কুসংস্কারে পূর্ণ। একথা সত্য, পরাধীন ভারতে নোংরা জিনিস ছিল, কিন্তু মহান জিনিসও ছিল। ভারতের শত্রুরা নোংরা জিনিস ঘেঁটে-ঘেঁটেই দেখাত, ভারতের সভ্যতার মহিমার কথা কদাপি বলত না। নিবেদিতার একটা বড় কাজ হল, ভারতের এইসব শত্রুদের সঙ্গে লড়াই করা; এরা যে-সব মিথ্যে কথা বলছে সেগুলো খণ্ডন করা। শত্রুরা ছিল সংখ্যায় অনেক, তাদের টাকাও অনেক। নিবেদিতা প্রায় একলা। কিন্তু তিনি ক্ষত্রিয় নারী। লড়াই করে গেছেন একাই। হার মানবার পাত্রী তিনি নন। গুরু বিবেকানন্দ কি বলেননি—নিবেদিতা সিংহিনী!

॥ ১০ ॥

আড়াই বছর ইউরোপ ও আমেরিকায় কাটাবার পরে ১৯০২ সালের গোড়ার দিকে নিবেদিতা ফিরে এলেন ভারতবর্ষে।

কয়েক মাস কাটল। তারপরে একদিন খুব ভোরে নিবেদিতার বাড়িতে কড়া নাড়ার শব্দ—কে? কে? এত ভোরে কে এল? দরজা খুলে দেখেন, দাঁড়িয়ে আছেন একজন—হাতে একখানি চিঠি। চিঠিটি হাতে নিয়ে খুলে পড়লেন। তারপরেই মনে হল—আকাশ ভেঙে পড়েছে মাথায়। চারিদিক শূন্য—আঁধার—শুধু আঁধার—

চিঠিতে লেখা ছিল—

স্বামীজী আর নেই—তাঁর মহাসমাধি।

চিরবিদায় নেবেন—তার ইঙ্গিত স্বামীজী যথেষ্টই দিয়েছিলেন। তিনি বলতে শুরু করেছিলেন, এবার চলে যাওয়াই ভালো। বড় গাছের তলায় ছোট গাছ বাড়তে পারে না। ছোটরা যদি বড় হয়ে ভার তুলে না নেয়, দেশ চলবে কি করে?

দেহত্যাগের দুদিন আগে স্বামীজী নিমন্ত্রণ করেছিলেন নিবেদিতাকে। আদর-যত্ন করে তাঁকে খাওয়ান। খাওয়ার পরে নিজেই আঁচানোর জল দেন, তারপরে হাত মুছিয়ে দেন।

গুরুকেই তো শিষ্য সেবা করে। এখানে যে উল্টো ঘটছে! নিবেদিতা তাই সংকুচিত হয়ে আপত্তি করেন। তাতে স্বামীজী বলেছিলেন—'কেন, খ্রীস্ট তো তাঁর শিষ্যের পা ধুইয়ে দিয়েছিলেন!'

হায়! খ্রীস্ট যে তাঁর মৃত্যুর আগে সে জিনিস করেছিলেন! এইভাবে স্বামীজী ইঙ্গিতে নিজের মৃত্যুর সম্ভাবনার কথা জানান। কিন্তু নিবেদিতা ধরতে পারেননি।

পারবেন কি করে? কয়েকদিন স্বামীজীকে বেশ সুস্থ দেখাচ্ছিল। শুক্রবার, ৪ঠা জুলাই। সেদিন বেশ ভাল আছেন। সকালে অনেকক্ষণ ধ্যান করলেন; দুপুরে শিষ্যদের সংস্কৃত পড়ালেন; বিকালে কয়েক মাইল হেঁটে বেড়িয়ে এলেন; ফেরার পরে সন্ধ্যায় যখন আরতির ঘণ্টা বাজছে, তখন নিজের ঘরে গিয়ে দক্ষিণেশ্বরের দিকে মুখ করে ধ্যানে বসলেন। হাতে ছিল জপমালা। ঘণ্টা-খানেক পরে মেঝেয় শুয়ে পড়লেন। আরও ঘন্টাখানেক পরে দুটি গভীর দীর্ঘশ্বাস। একটু শিশুর কান্নার মতো শব্দ। তারপর—

'ধ্যানের পাখায় ভর করে উড়ে গেল তাঁর আত্মা—এমন লোকে, যেখান থেকে আর ফিরতে হয় না। দেহটা পড়ে রইল ভাঁজ-করা কাপড়ের মতো।'

মূর্তিমতী বেদনার মতো নিবেদিতা এসে দেখলেন—বিবেকানন্দের প্রশান্ত প্রাণহারা দেহ শয়ান—যেন শায়িত শিব। নিবেদিতার

চোখে জল নেই। অশ্রুর চেয়ে গভীর তাঁর বেদনা। মাথার কাছে বসে ধীরে-ধীরে বাতাস করতে থাকেন। কয়েক ঘণ্টা সেইভাবে কেটে যায়। তারপরে নতুন গেরুয়া কাপড়ে সাজিয়ে, ফুল মালায় ঢেকে দিয়ে, স্বামীজীকে নিয়ে যখন যাত্রা আরম্ভ হল, সে যেন এক জীবন থেকে অন্য জীবনের পথে শোভাযাত্রা। গঙ্গাতীরে চিতা সাজানো হল, আগুন জ্বলল, ধীরে-ধীরে ছাই হয়ে যেতে লাগল সব কিছু—

না, তা সত্য নয়। নিবেদিতা তন্ময় হয়ে চিতার দিকে তাকিয়ে আছেন, এমন সময়ে কে যেন তাঁর জামার হাতায় টান দিল! কে? কী? অন্য কিছু নয়, এক টুকরো গেরুয়া কাপড় স্বামীজীর চিতা থেকে উড়ে এসে নিবেদিতার হাতের উপরে পড়েছে।

বিবেকানন্দ যাননি, শরীর ধরে না থাকলেও তিনি আছেন—সেই সংকেতই এসেছে প্রিয় শিষ্যার কাছে।

॥ ১১ ॥

'যদি আর একজন বিবেকানন্দ থাকত তাহলে বুঝত—বিবেকানন্দ কি করে গেল'—দেহত্যাগের দিন বিকালে বেড়াবার সময়ে বিবেকানন্দ বলেছিলেন প্রেমানন্দকে।

বিবেকানন্দ এখন নেই, আর একজন বিবেকানন্দকে সহজে পাওয়া যাবে না, কিন্তু বিবেকানন্দের শিষ্যা তো আছেন! বিবেকানন্দ কী ছিলেন তা জানাবার ব্রত নিয়ে ভারতের দিকে-দিকে ছুটে চললেন বিবেকানন্দ-শিষ্যা নিবেদিতা।

স্বামীজী বলেছিলেন, বড় গাছ ছোট গাছকে বাড়তে দেয় না। স্বামীজীর অবর্তমানে নিবেদিতা মুহূর্ত-মধ্যে অনেক বড় হয়ে গেলেন। কেননা এখনি তাঁকে বিবেকানন্দের পতাকা হাতে নিয়ে দাঁড়াতে হবে

ভারতবর্ষের প্রাণকেন্দ্রে।

তার আগে মুক্তি প্রার্থনা করতে গেলেন রামকৃষ্ণ সংঘের সভাপতি স্বামী ব্রহ্মানন্দের কাছে। গিয়ে বললেন, 'সংঘের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম আমি। আমাকে ছেড়ে দিন। এবার যে-কাজ আমি করব, তা সংঘের কাজ নয়।'

মুক্তি চাইতে দুঃখ পেতে হয়েছিল নিবেদিতাকে। স্বয়ং স্বামীজী রামকৃষ্ণ সংঘে তাঁকে প্রবেশ করিয়েছিলেন। সেই সংঘ থেকে চলে আসতে চাওয়া কি কম কষ্টের কথা! কিন্তু নিবেদিতা যে সংঘ ছেড়ে দিতে চাইছেন, তা কি স্বামীজীর কাজের জন্যই নয়? ভারতবর্ষ পরাধীন। ভারতের প্রয়োজন স্বাধীনতা। জন নোবলের নাতনী মার্গারেটের রক্তে আছে স্বাধীনতার আগুন। গুরু বিবেকানন্দও সেই আগুন কম জ্বালিয়ে তোলেননি। নিবেদিতা কি দেখেননি—কিভাবে ভারতের পরাধীনতার দুঃখ কুরে-কুরে খেয়েছে স্বামীজীকে নিশিদিন! দেখেননি কি, শিকলে-বাঁধা সিংহের মতো তাঁর পাগল-হওয়া কষ্টের চেহারা! ভারতের অপমান আর পতনের মূলে পরাধীনতা—নিবেদিতা অনুভব করেন। শান্তির বা অশান্তির পথে—যে ভাবেই হোক—ভারতকে মুক্ত করতে হবে। স্বাধীনতার লড়াই আরম্ভ করা দরকার। কিন্তু সে কাজ তো রামকৃষ্ণ সংঘে থেকে করা সম্ভব নয়, কেননা তা সন্ন্যাসী-সংঘ। স্বামীজী নিজে নিয়ম করে গেছেন, রামকৃষ্ণ সংঘে থেকে রাজনীতি করা চলবে না।

নিবেদিতার কথা প্রশান্তভাবে শুনলেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ, ধ্যানী মহাপুরুষ। তিনি স্বামীজীর অন্তরঙ্গ বন্ধু, শ্রীরামকৃষ্ণের মানস-সন্তান। নিবেদিতাকে খুব স্নেহ করেন। নিবেদিতার কথা শুনে তাঁকে মুক্তি দিলেন। তাঁর স্নেহ কিন্তু অব্যাহত রইল। এই মেয়েটিকে দেখার ভার স্বামীজী তাঁর উপরে দিয়ে গেছেন।

রামকৃষ্ণ সংঘ থেকে বিদায় নিয়ে নিবেদিতা নতুনভাবে নিজেকে পরিচিত করলেন—'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা।'

॥ ১২ ॥

'জাগো জাগো, ভারতের সন্তান! তোমরা এবার নেতা পেয়েছ, মন্ত্র পেয়েছ। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ তোমাদের নেতা। তাঁদের পতাকা-তলে তোমরা সমবেত হও! ভারত আমাদের জননী। জাতীয়তা আমাদের জননী। জননীর সন্তানেরা—ওঠো, জাগো।'

নিবেদিতার কণ্ঠস্বর ছড়িয়ে পড়ে ভারতের প্রান্তে-প্রান্তে, আকাশে-বাতাসে। সে যেন বিবেকানন্দেরই কণ্ঠধ্বনি। স্বামীজীর একটি কবিতার কয়েকটি ছত্র ধক্-ধক্ জ্বলতে থাকে :

ডাকে ভেরী—বাজে ঝরর্ ঝরর্ দামামা নকাড়,
বীরদাপে কাঁপে ধরা,
ঘোষে তোপ—বব-বব-বম্, বব-বব-বম্,
বন্দুকের কড়কড়া।

ধূমে ধূম ভীম রণস্থল, গরজি অনল
বমে শত জ্বালামুখী,
ফাটে গোলা, লাগে বুকে গায়, কোথা উড়ে যায়
আসোয়ার ঘোড়া হাতী।

পৃথ্বীতল কাঁপে থর্থর্, লক্ষ অশ্ববর—
পৃষ্ঠে বীর—ঝাঁকে রণে,
ভেদী ধূম গোলা বরিষণ, গুলি সন্সন্,
শত্রুতোপ আনে ছিনে।

ঐ পড়ে বীর ধ্বজাধারী, অন্য বীর তারি
ধ্বজা লয়ে আগে চলে,
তলে তার ঢের হয়ে যায় মৃত বীরকায়,
তবু পিছে নাহি টলে।

বিপ্লব-আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন নিবেদিতা। কাউন্ট ওকাকুরা নামে একজন বিখ্যাত জাপানী এসেছিলেন ভারতবর্ষে, স্বামী বিবেকানন্দকে জাপানে নিয়ে যাবার জন্ম। স্বামীজীর শরীর ভেঙে পড়েছিল বলে যেতে পারেননি। ওকাকুরা কিছুদিন ভারতে থেকে যান। ঘুরে বেড়িয়েছিলেন ভারতের নানা তীর্থে—ধর্মতীর্থে ও শিল্পতীর্থে। ওকাকুরা একদিকে ছিলেন শিল্পীদের গুরু, অন্যদিকে বিপ্লবপন্থী। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল—এশিয়া মহাদেশ থেকে ইউরোপীয়দের প্রভুত্ব দূর করা। সেইজন্য ভারতবর্ষে ইংরেজশাসনের বিরুদ্ধে বিপ্লব-সংগঠন যাতে গড়ে ওঠে, ওকাকুরা তার চেষ্টা করতে থাকেন। নিবেদিতা এ-ব্যাপারে ওকাকুরার সঙ্গে হাত মেলালেন।

ওদিকে পশ্চিম ভারতের বরোদা রাজ্যে এক বিরাট প্রতিভাবান ও শক্তিমান্ মানুষ যেন অপেক্ষা করছিলেন। তাঁর নাম অরবিন্দ ঘোষ। ইংলণ্ড থেকে উচ্চশিক্ষা শেষ করে ভারতে ফিরে বরোদার মহারাজার সেক্রেটারী হয়েছেন। অরবিন্দের চোখেও ছিল ভারতের মুক্তির স্বপ্ন। নিবেদিতার সঙ্গে অরবিন্দের সাক্ষাৎ ঘটল। নিবেদিতার মধ্যে অরবিন্দ দেখলেন শিখাময়ী বিপ্লবীকে। অনুভব করলেন অন্তরের ঐক্য। বিপ্লবীর সঙ্গে বিপ্লবীর সংযোগ ঘটে গেল।

—'তরুণদের চাই! কোথায় সেই অগ্নি-সন্তানেরা যারা মরণসাগরে ঝাঁপ দিয়ে ভারতের মুক্তির অমৃত উদ্ধার করে আনতে পারবে—'

এই ডাক দিয়ে নিবেদিতা ভারতের দিকে দিকে ছুটে চললেন। যেখানে যেমন প্রাণের সন্ধান পেলেন, সেখানেই শোনালেন অভয়-মন্ত্র। ধুঁইয়ে উঠতে লাগল আগুন নানা স্থানে।

সহসা দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠল বাংলাদেশ। তার আঁচ গিয়ে লাগল গোটা ভারতের দেহে!

সরকার এক অদ্ভুত আদেশ জারি করেছে—দু'টুকরো করে দেওয়া হবে বাংলাদেশকে।

কেন? এমন অন্যায় আদেশ কেন?

সরকার ভাল মানুষের মতো বলল—দেশকে দু'ভাগ করলে শাসনকাজের সুবিধা হবে।

কিন্তু সবাই বুঝল, আসল মতলবটা কি। বাংলাদেশে যে রাজনৈতিক চেতনা বেশী! তার জনসংখ্যাও যথেষ্ট। যদি বাংলা-দেশের মানুষ একজোট হয়ে সরকারের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়—সর্বনাশ! সুতরাং দাও বাংলাকে দু'ভাগ করে।

কোটি-কোটি বাঙালী দাঁড়িয়ে উঠল প্রতিবাদে। দেশের বুকের ভিতর থেকে যেন দেশজননী বেরিয়ে এলেন অপরূপ রূপে। 'আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি, কী অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী'—রবীন্দ্রনাথ গাইলেন সুরেলা গলায়।

তিনি গাইলেন :

বাংলার মাটি, বাংলার জল,
বাংলার বায়ু, বাংলার ফল,
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক
হে ভগবান্!

সকলে গাইল তাঁর সঙ্গে—

বাঙালীর প্রাণ, বাঙালীর মন
বাঙালীর ঘরে যত ভাই বোন
এক হউক, এক হউক, এক হউক
হে ভগবান্।

বন্দেমাতরম্ বন্দেমাতরম বন্দেমাতরম্

সরকার নিষিদ্ধ করে দিল 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি। পীড়ন চলল পুরাদমে। সদম্ভে জানালো সরকার—বাংলা-বিভাগ বদলাবে না।

'বদলাবোই, তাকে বদলাবোই আমরা। ঠিক করেছো যা, তাকে বেঠিক করে দেব'—বাংলাদেশ প্রতিজ্ঞা করে। তার জন্য আগে চাই ভাইয়ে ভাইয়ে মিল। তাই হাতে হাতে রাখী বেঁধে করা হল রাখীবন্ধন উৎসব। যেখানে সবাই মিলতে পারে এমন একটি ভবনের ভিত্তিস্থাপন করা হল, তার নাম 'মিলন-মন্দির'। অপরদিকে জানিয়ে দেওয়া হল—আমরা বিদেশী জিনিস বয়কট করব। ব্যবহার করব শুধু দেশী জিনিস।

আর করব অপমানের প্রতিবাদ।

'প্রতিবাদ করলো না, ছি ছি, প্রতিবাদ করলো না কেউ!'—কনভোকেশন হল থেকে বেরিয়ে আসতে-আসতে রাগে লজ্জায় রাঙা মুখে নিবেদিতা বললেন।

ভারতের গভর্নর জেনারেল তখন লর্ড কার্জন। দাম্ভিকের শিরোমণি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি-বিতরণ সভায় দাঁড়িয়ে, সমবেত ভারতীয়দের মুখের সামনে তিনি বলেছেন—প্রাচ্যদেশের (যেমন ভারতবর্ষের) লোকেরা রঙ ফলিয়ে কথা বলে। মানে দাঁড়ায়, তারা মিথ্যাবাদী।

পরদিন সংবাদপত্রে একটি চমৎকার খবর বেরুল—লর্ড কার্জনই মিথ্যাবাদী। তিনি যখন কোরিয়ায় রাজদূত হয়ে গিয়েছিলেন, তখন নিজের বয়স গোপন করেছিলেন মিথ্যা কথা বলে।

আর কেউ নয়, নিবেদিতাই ঐ লেখাটি লিখেছিলেন। জোঁকের মুখে নুন পড়ল। নিবেদিতার বুদ্ধির কাছে নাজেহাল হলেন কার্জন।

গোপন বিপ্লবী দলের সঙ্গে নিবেদিতার যোগ থাকলেও স্বাধীনতার জন্য প্রকাশ্য যেসব আন্দোলন চলছিল—তাদের সাহায্যও নিবেদিতা নিয়েছেন। চরমপন্থীদের যেমন তিনি প্রেরণা দিতেন, নরমপন্থীরাও তেমনি তাঁর কাছ থেকে উৎসাহ পেত। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, ভারতের মঙ্গলের জন্য যার কাছ থেকে যখন যেভাবে পারা যায়, কাজ

করিয়ে নেওয়া। তাই বিপ্লবী অরবিন্দ, চরমপন্থী তিলক বা বিপিন পাল, মধ্যপন্থী লাজপত রায়, নরমপন্থী সুরেন্দ্রনাথ বা রাসবিহারী ঘোষ—সকলেরই তিনি বন্ধু ও সহায়ক। নরমপন্থীদের সেরা নেতা গোপালকৃষ্ণ গোখলের তিনি ছিলেন পরম বন্ধু। গোখলের ধীর-স্থির মতগুলি সবসময়ে নিবেদিতার পছন্দ হত না, কিন্তু তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন গভীরভাবে, তাঁর প্রতিভা ও উদারতার জন্য। গোখলেও অপরদিকে নিবেদিতার চরিত্রতেজে এতই অভিভূত ছিলেন যে, তাঁর মনে হত—নিবেদিতা যেন ঝঞ্ঝা, বিদ্যুৎ বা বজ্রের মতো প্রকৃতির এক মহাশক্তি।

১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে বারাণসীতে কংগ্রেসের অধিবেশন হল। গোখলে সেবার সভাপতি। কংগ্রেসে যোগ দিতে নিবেদিতা গিয়েছিলেন। কাশীতে তাঁর বাসায় দেশনেতাদের ভিড় লেগে থাকত সারাক্ষণ। কংগ্রেসে প্রাণোদ্দীপ্ত বক্তৃতাও নিবেদিতা করেছিলেন।

কিন্তু নিবেদিতার স্বভাব নয় নিজেকে নেত্রীরূপে সামনে এগিয়ে দেওয়া। তাঁর কাজ ধরিত্রীর, তাঁর কাজ ধাত্রীর। ধরিত্রী যেমন প্রাণরস দিয়ে বাঁচিয়ে তোলে গাছকে, ধাত্রী যেমন শিশুকে লালন করে বড় করে তোলে—নিবেদিতাও তেমনই করে গেছেন।

তাই পরের বছর তিনি কংগ্রেসের সামনে মেলে ধরলেন জাতীয় পতাকা। কংগ্রেসের পতাকা নেই, অথচ পতাকা চাই। সে পতাকা তৈরী করলেন নিবেদিতা।

নিবেদিতার পতাকা—রক্তপতাকা। টকটকে লাল রঙের উপরে বজ্র আঁকা। আর আড়াআড়ি করে লেখা—'বন্দেমাতরম্'।

নিবেদিতার পতাকার উপরে আঁকা বজ্র-চিহ্নটির গভীর অর্থ আছে। বজ্র-চিহ্নটি তিনি দেখেছিলেন বুদ্ধগয়ায় গিয়ে। বৌদ্ধ-গাথায় আছে, এই বজ্র দেবরাজ ইন্দ্র দিয়েছিলেন বুদ্ধদেবকে, পাপকে পরাস্ত করার জন্য। কিন্তু ইন্দ্র বজ্রটিকে পেয়েছিলেন কোথা থেকে? সে-বিষয়ে পুরাণে একটি গল্প আছে, নিবেদিতা তা মনে করিয়ে দিয়েছিলেন।

১৯০৫ সালে বারাণসী কংগ্রেসে নিবেদিতা ভাষণ দিয়েছিলেন

দেবতারা থাকেন স্বর্গে, তাঁরা ন্যায় ও ধর্মকে রক্ষা করেন। অসুরেরা থাকে পাতালে—তারা ধর্মের শত্রু। তারা বারবার দেবতাদের আক্রমণ করে; আর সর্বনাশের কথা, দেবতাদের হারিয়ে দেয়। সত্যই সর্বনাশ, কারণ দেবতারা হারলে ন্যায় ধর্ম সব ধ্বংস হয়ে যাবে। তাহলে উপায়? এক্ষেত্রে এমন একটা অস্ত্র অবশ্যই চাই, অসুরেরা যার কাছে দাঁড়াতে পারবে না। বজ্র সেই অস্ত্র, যা তৈরী হতে পারে—স্বেচ্ছায় নিজের শরীর দান করেছেন এমন মানুষের অস্থি দিয়ে। অসম্ভব। তেমন মানুষ কি কেউ আছেন, থাকতে পারেন? নিশ্চয় আছেন—তাঁরই নাম দধীচি। মহাঋষি তিনি। দেবতারা তাঁর কাছে হাজির হলেন। কিন্তু কি করে পাড়বেন কথাটা! দেবতাদের লজ্জা হচ্ছিল। এমন কথা কি মুখ ফুটে কাউকে বলা যায়? দধীচি নিজেই জিজ্ঞাসা করলেন আগ্রহী হয়ে—কী ব্যাপার, সহসা দেবসমাগম কেন? অগত্যা দেবতাদের বলতে হল। 'এই কথা!'—স্নিগ্ধ হাসিতে
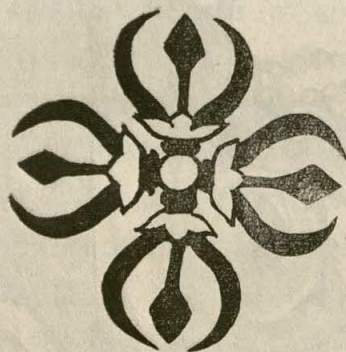
নিবেদিতার বজ্র

দধীচির মুখ ভরে গেল—'এতবড় সৌভাগ্য কি আমার হবে যে, জগতের মঙ্গলের জন্য এই দেহ দান করতে পারব!'—বলতে-বলতে, হাসতে-হাসতে, দধীচি শরীর ছেড়ে চলে গেলেন—তাই দিয়েই তৈরী হল বজ্র।

নিবেদিতা উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠেন: ঐ দেখ উড়ছে পতাকা, ডাক দিচ্ছে মানুষকে উত্থানের জন্য, আত্মত্যাগের জন্য। ঐ পতাকার তলায়

তোমরা এসো, যারা ভালবাসো দেশকে, ন্যায়কে, সত্যকে! ঐ দেখ, পতাকার বুকে আঁকা রয়েছে বজ্র—ঐ বজ্র আর কিছু নয়—স্বার্থহীন ভালবাসার চিহ্ন—দধীচির মতো ভালবাসা। মা, মা! আমাদের স্বার্থ দূর করো! আমাদের আগুনের মতো জ্বলন্ত ভালবাসা দাও! আমাদের দেবহস্তের বজ্র করে তোলো!

নিবেদিতার কল্পনা থেকে পতাকা এসেছিল। ভারতমাতার ছবিও নিশ্চয় তাঁর প্রেরণার ফল। সে ছবি আঁকলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। অপরূপ এক ছবি। ছবির ব্যাখ্যা করে নিবেদিতা লিখলেন :

সবুজে শ্যামলে ভরা মাঠ। তারই উপরে দাঁড়িয়ে আছেন ভারতমাতা। পিছনে নীল আকাশ। মায়ের দুটি কোমল শ্রীচরণ,

তার নীচে আবছা দেখা যায় চারটি শ্বেতকমল। পৌরাণিক দেবীর মতো তাঁর চার হাত। সেই চার হাতে ধরা আছে সন্তানের জন্য—শিক্ষার পুথি, দীক্ষার মালা, লজ্জার বস্ত্র, আর অন্নের শ্যাম-ধান্য। পবিত্র সুন্দর ললাট মায়ের, উদার স্নিগ্ধ আঁখি—আর মহিমার জ্যোতি মাথাটি ঘিরে—

মা—আমার মা—ভারতমাতা!

ভারতমাতার এই সেরা মেয়েটি তারপর একদিন দু'চোখ-ভরা জল নিয়ে হাজির হলেন দুঃখী ভারতবাসীর মাঝখানে। পূর্ববঙ্গে ভয়াবহ

বন্যা হয়েছে। তারপরেই দুর্ভিক্ষ। জলে ভেসে আছে চারদিক। কান্নায় ভেসে গেছে চারদিক। হাজারে-হাজারে মানুষের কঙ্কালে ছেয়ে আছে বাংলার বাট, বাংলার মাঠ। শুধু ক্ষুধা—শুধু ক্ষুধা—শুধু ক্ষুধা। দেশের বুক চিরে একটিই কান্নার গান :

'অন্ন দে মা, অন্ন দে মা, অন্ন দে মা—অন্নদা!'

স্নেহ নিয়ে, সেবা নিয়ে, নিবেদিতা দু'মাস ধরে ঘুরলেন জলে-কাদায় দেশ-শ্মশানের ভিতরে। যেখানে গেছেন, দেশলক্ষ্মী বলে সবাই চিনেছে তাঁকে—যত লক্ষ্মীহারার দল!

কিন্তু ভিতরে-ভিতরে ভেঙে পড়েছেন তিনি। সন্তানের এত দুঃখ চুরমার করে দিল তাঁর মাতৃহৃদয়কে। শরীর ভেঙে গেল। মুমূর্ষু অবস্থায় কাটল কতদিন। এর পরে পুরনো স্বাস্থ্য আর ফিরে পাননি।

॥ ১৩ ॥

আমাদের দেশের একালের সবচেয়ে বড়ো কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই নিবেদিতাকে দেখেই নমস্কার করে বললেন, তুমি লোকমাতা। ভারতের জাতীয় মহাকবি যাঁকে লোকমাতা বলেছেন, তাঁর মহিমা কতখানি, তা আমাদের কল্পনাতেও আসে না।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নিবেদিতার পরিচয় সুগভীর। দিনের পর দিন তাঁরা একত্রে আলোচনা করেছেন—কাব্য, সঙ্গীত, ধর্ম ও কর্মের বিষয়ে। রবীন্দ্রনাথকে নিবেদিতা শ্রদ্ধা করতেন তাঁর প্রতিভার জন্য, আর শালীন সুন্দর চরিত্রের জন্য। রবীন্দ্রনাথের অতিথি হয়ে তিনি শিলাইদহে কাটিয়ে এসেছেন। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে সভায়-সভায় ঘুরেছেন। কবিকে নিয়ে গেছেন বিবেকানন্দের বেলুড় মঠে, বুদ্ধের বুদ্ধগয়ায়।

বুদ্ধগয়ায় সেই ভ্রমণটি অবিস্মরণীয়। দলে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র বসু ও তাঁর স্ত্রী অবলা বসু, স্টেটসম্যানের সম্পাদক মিঃ র‍্যাটক্লিফ ও তাঁর পত্নী, ডঃ যদুনাথ সরকার, মথুরানাথ সিংহ, সিস্টার ক্রিস্টিন এবং স্বামী শংকরানন্দ। নিবেদিতা দলের নেত্রী।

পরম মানব বুদ্ধদেব বোধিলাভ করেছিলেন বুদ্ধগয়ায়—সে কত হাজার বছর আগে! কিন্তু সেই স্মৃতি অক্ষয় হয়ে আছে এই পুণ্য-ভূমিতে। স্মৃতির শিখাটিকে মনে জ্বালিয়ে রেখে এঁরা গ্রামের পথে ঘুরতেন সারাদিন। প্রতিটি পাথর দেখতেন, প্রতিটি ধূলিকণাকে মনে করতেন পবিত্র। সূর্য ঢলে পড়ত, সোনালি আলো ক্রমে লাল, তারপরে ধূসর, তারও পরে কালো হয়ে যেত। যেখানে বুদ্ধদেব বোধিলাভ করেছিলেন, সেখানে সবাই বসতেন। বুদ্ধকথা পড়তেন
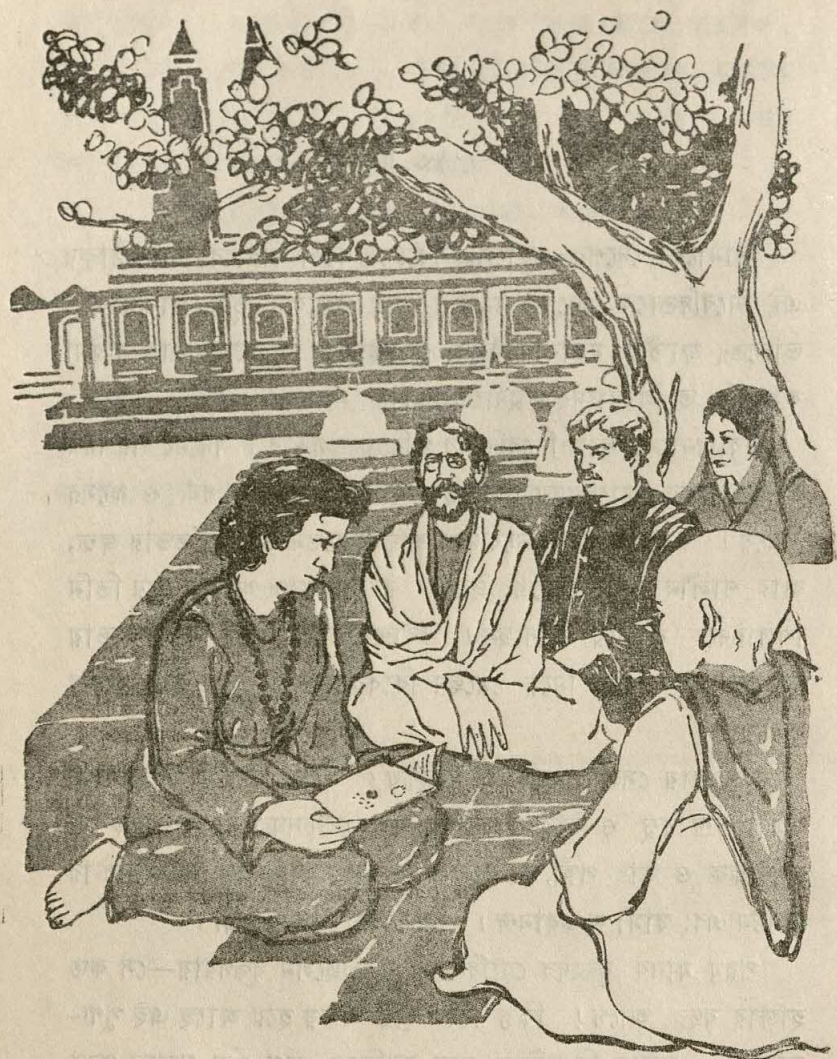
বুদ্ধগয়ায় নিবেদিতা, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, অবলা বসু, জাপানী ভিক্ষু ফুজি

নিবেদিতা; রবীন্দ্রনাথ গাইতেন গান; আর ফুজি বলে জাপানী ভিক্ষু বোধিবৃক্ষতলে উচ্চারণ করতেন স্তোত্র মৃদুস্বরে প্রতি সন্ধ্যায়:

নমো নমো বুদ্ধ দিবাকরায়,
নমো নমো গোতম চন্দ্রিকায়,
নমো নমো অনন্তগুণ-নরায়,
নমো নমো শাক্যনন্দনায়

তারপরে রাত্রি হত। বিশাল আকাশ উপরে নক্ষত্রের চোখ মেলে তাকিয়ে—যেন বুদ্ধের করুণা-নয়নের মতো। আর তারই নীচে তখন পৃথিবীর পটে ফুটে থাকত কয়েকটি সেরা প্রাণের তারা, আকাশের স্বপ্নে বিভোর হয়ে।

মহাকবির যোগ্য ভাষায় রবীন্দ্রনাথ নিবেদিতাকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। তারই কয়েকটি লাইন:

"তাঁহার সর্বতোমুখী প্রতিভা ছিল। সেইসঙ্গে আর একটি জিনিস ছিল, সেটি তাঁহার যোদ্ধৃত্ব। তাঁহার বল ছিল, এবং সেই বল তিনি অন্যের জীবনের উপর একান্ত বেগে প্রয়োগ করিতেন।

তাঁহার সহিত পরিচয়ের পর হইতে এমন বারংবার ঘটিয়াছে যখন তাঁহার চরিত স্মরণ করিয়া ও তাঁহার প্রতি গভীর ভক্তি অনুভব করিয়া আমি প্রচুর বল পাইয়াছি। নিজেকে এমন করিয়া সম্পূর্ণ নিবেদন করিয়া দিবার আশ্চর্য শক্তি আর কোনো মানুষে প্রত্যক্ষ করি নাই।

এই জন্যই এই একটি আশ্চর্য দৃশ্য দেখা গেল—যাঁহার অসামান্য শিক্ষা ও প্রতিভা, তিনি এক গলির কোণে এমন এক কর্মকেন্দ্র বাছিয়া লইলেন, যাহা পৃথিবীর লোকের চোখে পড়িবার মতো একেবারেই নহে। বিশাল বিশ্বপ্রকৃতি যেমন তাহার সমস্ত বিপুল শক্তি লইয়া মাটির নিচেকার অতি ক্ষুদ্র একটি বীজকে পালন করিতে অবজ্ঞা করে না, এও সেইরূপ।

বস্তত তিনি ছিলেন লোকমাতা। যে মাতৃভাব পরিবারের বাহিরের একটি সমগ্র দেশের উপরে আপনাকে ব্যাপ্ত করিতে পারে, তাহার মূর্তি তো ইতিপূর্বে আমরা দেখি নাই। তিনি যখন বলিতেন Our people তখন তাহার মধ্যে যে একান্ত আত্মীয়তার সুরটি লাগিত আমাদের কাহারও কণ্ঠে তেমনটি তো লাগে না।

শিবের প্রতি সতীর সত্যকার প্রেম ছিল বলিয়াই তিনি অর্ধাশনে অনশনে অগ্নিতাপ সহ্য করিয়া আপনার অত্যন্ত সুকুমার দেহ ও চিত্তকে কঠিন তপস্যায় সমর্পণ করিয়াছিলেন। এই সতী নিবেদিতাও দিনের পর দিন যে-তপস্যা করিয়াছিলেন, তাহার কঠোরতা অসহ্য ছিল—তিনিও অনেকদিন অর্ধাশন অনশন স্বীকার করিয়াছিলেন, তিনি গলির মধ্যে যে-বাড়ির মধ্যে বাস করিতেন সেখানে বাতাসের অভাবে গ্রীষ্মের তাপে বীতনিদ্র হইয়া রাত কাটাইয়াছেন, তবু ডাক্তার ও বান্ধবদের সনির্বন্ধ অনুরোধেও সে বাড়ি পরিত্যাগ করেন নাই।

মানুষের মধ্যে যে শিব আছেন সেই শিবকেই এই সতী সম্পূর্ণ আত্ম-সমর্পণ করিয়াছিলেন। এই মানুষের অন্তর-কৈলাসের শিবকেই যিনি আপন স্বামীরূপে লাভ করিতে চান তাঁহার সাধনার মতো এমন কঠিন সাধনা আর কার আছে?"

॥ ১৪ ॥

বাগবাজারের ছোট এক গলিতে একটি বিদ্যালয় স্থাপন ক'রে নিবেদিতা ভারতের কাজ শুরু করেন—তারপর তিনি নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন সারা ভারতের শিক্ষার সাধনায়—তবু ঐ বাগবাজারের গলির স্কুলটি ছিল তাঁর প্রাণের ধন। সমস্ত কাজের মধ্যেও এই

বিদ্যালয়ের জন্য সময় সংগ্রহ করে নিতেন। ভগিনী ক্রিষ্টিন এবং সুধীরা বসুর মতো যোগ্য সহায়িকা তিনি পেয়েছিলেন।

কী ভালবাসাই না ভালবাসতেন মেয়েগুলিকে! তাদের মঙ্গলের জন্য তাঁর চিন্তার অবধি ছিল না। বাগবাজারের গোঁড়া হিন্দুপল্লীতে মেয়েদের শিক্ষা দেবার কথা তখন ভাবাই হত না, বিশেষত বিধবা হলে তো কথাই নেই। অনুরোধে উপরোধে কেউ-কেউ অল্পবয়সী বিধবা মেয়েদের স্কুলে পাঠালেও ব্যাপারটাকে ভাল মনে নিতে পারতেন না। এমনি একটি বিধবা মেয়ের স্কুলে আসা তার বাড়ির লোকজন প্রায়ই বন্ধ করে দিতেন। একদিন তাই নিবেদিতা নিজে গেলেন মেয়েটির বাড়িতে। মেয়েটির মামা তার অভিভাবক। তাঁকে অনুনয় করে নিবেদিতা বললেন, 'মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য মেয়েটিকে ভিক্ষা দিন আমাকে—' বলতে-বলতে তিনি ভদ্রলোকের পায়ের কাছে নতজানু হয়ে বসলেন। তখন ভদ্রলোকের পক্ষে আর 'না' বলা সম্ভব হল না। নিবেদিতা মেয়েটিকে বাড়ির ভিতর থেকে ডাকিয়ে আনালেন। সে এলে তাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'মেয়ে, আমার মেয়ে, এবার থেকে তুমি প্রতিদিন স্কুলে যেতে পারবে।'

আর একটি অল্পবয়সী বিধবা মেয়েকে তিনি বড় ভালবাসতেন। একাদশীর দিন ঐটুকু মেয়েকেও সমাজের নিয়মে উপবাসে থাকতে হত। শুধু মিষ্টি বা শরবৎ খাওয়া চলত। মেয়েটির কষ্টে নিবেদিতা কাতর হয়ে পড়তেন। প্রতি একাদশীতে নিজের কাছে বসিয়ে তাকে খাওয়াতেন। একবার সেকথা ভুলে চলে গেছেন জগদীশচন্দ্র বসুর বাড়িতে। সেখানে কথাবার্তা, গল্প, খাওয়া-দাওয়ার মধ্যে আছেন, হঠাৎ মনে পড়ে গেল উপবাসী মেয়েটির কথা। সব ফেলে তখনি ছুটে এলেন। মেয়েটিকে ডাকিয়ে এনে, তাকে খেতে দিয়ে, বড় বেদনায় বারবার বলতে লাগলেন, 'আমার মেয়ে, আমার মেয়ে, আমি ভুলে গেছলুম। আহা, তোমাকে খেতে দিইনি, আমি নিজে খেয়েছি।

ছি ছি, কী অন্যায়, কী অন্যায়!'

এমনই ভালবাসা। আবার শাসনও কম কঠোর নয়। একদিন নিবেদিতা পড়াচ্ছেন। একজনকে কী-একটা প্রশ্ন করলেন। সে উত্তর দেবার আগেই অন্য একটি মেয়ে তড়বড় করে উঠে উত্তর দিয়ে দিল। নিবেদিতা কোনো কথা না বলে তার দিকে শুধু স্থির চোখে তাকালেন। সেই চাউনিতে সে এতটুকু হয়ে গেল। তারপরে যতক্ষণ পড়ালেন, তাকে একটি প্রশ্নও করলেন না। সেটা মেয়েটির মনে এমনই বাজল যে, সারাদিন সে কাঁদল। কয়েকদিন পরে এক পূজাবাড়িতে নিবেদিতা গেছেন, মেয়েটিও সেখানে গেছে। নিবেদিতাকে দেখেই সব ভুলে 'সিস্টার' বলে সে ছুটে এল। নিবেদিতাও 'আমার মেয়ে' বলে তাকে জড়িয়ে কোলে তুলে নিলেন। বাড়ি ফিরে মেয়েটি মাকে বলল, 'মা, সিস্টারকে আজ কী সুন্দর দেখতে হয়েছিল! কেমন সুন্দর হেসেছিলেন আমার দিকে চেয়ে! তাঁকে দেখে আমার একটুও ভয় হয়নি।'

নিবেদিতার স্কুলে শিক্ষার বেশীর ভাগ মুখে-মুখে। ছবি আঁকা, সেলাই, খেলাধূলায় জোর দেওয়া হত। মেয়েদের নিয়ে নিবেদিতা প্রায়ই নানা জায়গায় বেড়াতে যেতেন; কখনো দক্ষিণেশ্বরের মতো তীর্থস্থানে, কখনো যাদুঘর বা চিড়িয়াখানার মতো দর্শনীয় জায়গায়। সেখানে নিয়ে গিয়ে প্রতিটি জিনিস যত্ন করে মেয়েদের বুঝিয়ে দিতেন। তাদের আচার-আচরণ যাতে সুষ্ঠু হয়, সেদিকেও তাঁর নজর ছিল প্রখর। মেয়েদের খেতে দিতেন শালপাতার ঠোঙায়। ঠোঙাগুলি খাওয়ার পরে পাছে তারা যেখানে-সেখানে ছড়ায়, তিনি নিজে একটি ঝুড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন, তারই মধ্যে ঠোঙাগুলি ফেলতে হত। তিনি কখনো কাউকে 'পারবো না' কথাটা বলতে দিতেন না; 'নিশ্চয় পারব'—এই কথাটাই শেখাতেন। স্বামীজী তাই শিখিয়ে গেছেন। নিবেদিতা মেয়েদের বলতেন, "স্বামীজীর নাম 'বীরেশ্বর'। তিনি বীরগণের ঈশ্বর। পৃথিবীর বীরেরা তাঁর অনুসরণ করবে। তোমরা

স্বামীজীর সন্তান। তোমাদের বিদ্যালয়ের উপরে স্বামীজীর নিঃশ্বাস রয়েছে। তোমরা বীর রমণী হবে।" মেয়েদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে তিনি উদ্দীপ্ত হয়ে গাইতেন—'আগে চল, আগে চল, দলে দলে।'

স্বামীজীর গুরু, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ—বিশ্বগুরু। নিবেদিতা শেখাতেন, 'শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের আরাধ্য দেবতা। তোমরা সবাই পূজা করবে তাঁকে।' একদিন পড়াবার সময়ে নিবেদিতার চোখে পড়ল, ঘরের একদিকে আছে পৃথিবীর মানচিত্র, অন্যদিকে শ্রীরামকৃষ্ণের ছবি।—'না, না, ওখানে নয়, ওখানে নয়'—বলে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের ছবির দিকে এগিয়ে গেলেন। তারপর ছবিটিকে খুলে নিয়ে এসে পৃথিবীর মানচিত্রের উপরে ঝুলিয়ে দিলেন। অপরূপ হাসিতে ভরে গেল তাঁর মুখ। বললেন 'রামকৃষ্ণদেব—জগৎগুরু ছিলেন ; জগতের মানচিত্র তাঁর পদতলে থাকাই উচিত।'

নিবেদিতার শিক্ষার মধুরতম সময় আসত যখন গল্প করতেন ছোটদের নিয়ে। তাঁর গলায় যাদু ছিল। কল্পনার পাখায় চড়িয়ে সকলকে উধাও করে নিয়ে যেতে পারতেন। ছোট-ছোট মেয়েরা ঘিরে বসত তাঁর চারধারে। গানে আর স্বপ্নে-ভরা সুরে তিনি বলে যেতেন। হয়ত সদ্য যে-জায়গা বেড়িয়ে এসেছেন, তারই গল্প করলেন। একবার রাজপুত বীরত্বের মহাতীর্থ চিতোর বেড়িয়ে আসবার পরে যখন তার কথা বলছিলেন, তখন মনে হচ্ছিল—চিতোরের প্রতিটি পাথর যেন তাঁর চোখের সামনে রয়েছে, যেন সাক্ষাৎ চিতোরের বাতাসে তিনি শ্বাস নিচ্ছেন। বিভোর হয়ে তিনি বলে চললেন—'আমি পাহাড়ে উঠে পাথরের উপরে হাঁটু গেড়ে বসলাম ; চোখ বুজে, দেবী পদ্মিনীর স্মরণ করতে লাগলাম'—বলতে-বলতে তিনি সত্যসত্যই দু' চোখ বুজে, দু'হাত জোড় ক'রে, স্তব্ধ হয়ে রইলেন। সে এক অপার্থিব দৃশ্য। কিছু পরে মৃদুস্বরে ধীরে-ধীরে বললেন, 'অনলকুণ্ডের সামনে পদ্মিনীদেবী হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আছেন ; আমি চোখ বুজে পদ্মিনীর শেষ চিন্তাটি আমার

মনে আনার চেষ্টা করতে লাগলাম। আঃ কি সুন্দর! কি সুন্দর!'

অবাক হয়ে মেয়েরা তাকিয়ে থাকে। তারা শোনে: মেবারের রাজধানী চিতোর আক্রমণ করেছিল শত্রুরা; রাজপুতেরা দীর্ঘ সময় যুঝেও শেষপর্যন্ত নিজেদের রাজধানী রক্ষা করতে পারেন নি; কিন্তু শত্রুসৈন্য দুর্গ অধিকার করার আগেই সারি-সারি চিতা জ্বলেছিল রাজপ্রাসাদের প্রাঙ্গণে; নারী-মর্যাদা রক্ষার জন্য সঙ্গিনীদের নিয়ে সেই চিতায় উঠেছিলেন রানী পদ্মিনী; আত্মবিসর্জন দিয়েছিলেন জহর-ব্রত করে।

সেই রানী পদ্মিনীর মহিমার ছবি প্রত্যক্ষ দেখল বালিকারা—নিবেদিতার শুভ্র স্তব্ধ মূর্তির দিকে তাকিয়ে।

নিবেদিতা অস্ফুট স্বরে বললেন, 'ভারতবর্ষ ভারতবর্ষ ভারতবর্ষ! মা মা মা! ভারতের কন্যাগণ, তোমরা সকলে জপ করবে—ভারতবর্ষ ভারতবর্ষ ভারতবর্ষ! মা, মা মা।'

জপমালা নিয়ে নিজেই জপ করতে লাগলেন—'মা! মা! মা!'

॥ ১৫ ॥

ভারতবর্ষ সবদিক থেকে বড় হয়ে উঠুক—এই ছিল নিবেদিতার কামনা। ভারতের সভ্যতার মহিমা তিনি গভীরভাবে অনুভব করেছিলেন। সে মহিমার স্পর্শ যাতে বিশ্ববাসী লাভ করতে পারে সেজন্য ভারতের দেহ-মন-প্রাণের ইতিহাস তিনি লিখেছেন অপূর্ব ভাষায়। ইংরেজীতে লেখা সেইসব প্রবন্ধ আর বই সারা পৃথিবীতে ভারতীয় সংস্কৃতির মর্মকাহিনী বলে গৃহীত হয়েছিল। 'দি ওয়েব অব ইণ্ডিয়ান লাইফ' বা 'ভারতীয় জীবনজাল' নামক বইটি তেমনই এক শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।

নিবেদিতা এখানেই থামলেন না। ভারতবর্ষ কেবল অতীতেই বড় ছিল না—ধর্মে-দর্শনে এখনো তার সভ্যতার গৌরব অম্লান—শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ তো একালেরই মানুষ। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, ভারতবর্ষ পিছিয়ে আছে বিজ্ঞানে। অথচ বিজ্ঞানের জয়যাত্রার এই যুগ। ভারতের উন্নতির জন্য তাই বিজ্ঞানের উন্নতি চাই।

ভারতের সৌভাগ্য, বিজ্ঞানেও বিরাট প্রতিভার অভ্যুদয় দেখা গেল এইসময়ে। জগদীশচন্দ্র বসু সেই প্রতিভা। পৃথিবীর মানুষ চমকিত হয়ে তাঁর অপূর্ব আবিষ্কারের কথা শুনল। জগতের সেরা

বৈজ্ঞানিকদের সারিতে তাঁর স্থান হল।

তাঁর উন্নতির পথে কিন্তু বাধার শেষ ছিল না। তিনি যে পরাধীন দেশের মানুষ! ইংরেজ শাসকেরা পরাধীন দেশ থেকে এতবড় প্রতিভার উদয়কে ভাল চোখে দেখে কি করে? যতভাবে সম্ভব তারা জগদীশচন্দ্রের পথে বাধার সৃষ্টি করতে লাগল। বড়ো লজ্জার কথা, এদেশের অহঙ্কারী ইংরেজরাই নয়, খাস ইংলণ্ডের বৈজ্ঞানিক সমাজের এক অংশও ঈর্ষা ক'রে তাঁর প্রতিভা স্বীকার করতে চায়নি। নিবেদিতা জগদীশচন্দ্রের পক্ষে লড়াই শুরু করে দিলেন। যেখানে সম্ভব সেখানেই তাঁর আবিষ্কারের মূল্যের কথা প্রচার করতে লাগলেন। জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞানাগারের জন্য টাকার দরকার; মিসেস ওলি বুলকে ধরে টাকার জোগাড় করলেন। সেইসঙ্গে জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারগুলিকে সুন্দর করে সাজিয়ে লেখার ভারও নিলেন। জগদীশচন্দ্রের প্রথম দিককার সব কয়টি বইয়ের ভাষা নিবেদিতার।

জগদীশচন্দ্র ও তাঁর গুণবতী স্ত্রী অবলা বসুর সঙ্গে নিবেদিতার গভীর অন্তরঙ্গতা হয়েছিল। নিবেদিতা যেন বসু-পরিবারের মানুষ হয়ে গিয়েছিলেন। জগদীশচন্দ্র নিবেদিতার চেয়ে বেশ কয়েক বৎসরের বড় হলেও মাতৃরূপিণী নিবেদিতা তাঁকে ডাকতেন 'খোকা' বলে। আর জগদীশচন্দ্রের পত্নীকে বলতেন 'বো' অর্থাৎ বউ বা বৌমা। জগদীশ-চন্দ্রকে শ্রদ্ধাভরে তিনি 'বিজ্ঞানের মানুষটি'—এই নামেও ডাকতেন।

নিবেদিতার পবিত্র স্মৃতিকে জগদীশচন্দ্র অন্তরের গভীরতম স্থানে রেখে পূজা করতেন। কয়েক বছর পরে যখন তিনি তাঁর 'বিজ্ঞান-মন্দির' প্রতিষ্ঠা করেন, তার দ্বারপ্রান্তে দীপহস্তে একটি নারীর মূর্তি স্থাপন করেন, যিনি এই বিজ্ঞান-মন্দিরের আলোকদূতী।

সে মূর্তি নিবেদিতার।

বৈজ্ঞানিকের গবেষণাগারের মতোই শিল্পীর চিত্রশালাও জাতির সংস্কৃতিপীঠ। ভারতের শিল্পীরা একদিন অজন্তা গুহার ছবি এঁকে-

ছিলেন। চিত্রশিল্পে সেদিন ভারত পৃথিবীতে অগ্রণী। সে চিত্রের ধারা কিন্তু রুদ্ধ হয়ে গেছে। তাকে নতুন করে প্রবাহিত করতে না পারলে জাতির জীবন সৌন্দর্যরসে সিক্ত হবে না। নিবেদিতা তাই বললেন, 'ভারতীয় চিত্রশিল্পের জাগরণ আমার জীবনস্বপ্ন।'

কলকাতা তখন ভারতের রাজধানী। এখানকার আর্ট স্কুল বিখ্যাত। স্কুলে বিলেতী পদ্ধতিতে ছবি আঁকা শেখানো হত, ভারতীয় চিত্রধারার চর্চা একেবারেই ছিল না। আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ ছিলেন ই বি হ্যাভেল। তিনি সাহেব হলে হবে কি, মনেপ্রাণে ভারতীয় জীবনধারার অনুরাগী। নিবেদিতা হ্যাভেল-সাহেবকে বললেন, 'এসব কি শেখাচ্ছ ছেলেদের? বিদেশী ঢঙ নকল করে কি দেশের শিল্পী তৈরী হয় কখনো?'

হ্যাভেল বললেন, 'আমি কি করব! রেখা টানতে, তুলি বুলোতে ছেলেদের শেখাতে পারি—তাদের তো শিল্পী করে তুলতে পারি না!'

নিবেদিতা উত্তরে বললেন, 'ঠিক আছে, শিল্পী হবার পক্ষে যা দরকার আমি তা দেব তাদের—দেবো এদেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতির দীক্ষা, তারা যাতে বিদেশের নকলনবিশ না হয়ে দেশের শিল্পী হয়ে উঠতে পারে।'

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁর শিষ্যের দল, যেমন নন্দলাল বসু, সুরেন গঙ্গোপাধ্যায়, অসিত হালদার প্রভৃতি নিবেদিতার সংস্পর্শে এলেন। নিবেদিতা চাইলেন, ভারতীয় সংস্কৃতির রসে তাঁদের চিত্ত হোক সিক্ত ও সঞ্জীবিত। নন্দলালদের পাঠালেন অজন্তা গুহার ছবি নকল করতে। অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর শিষ্যদলের দেশী পদ্ধতিতে আঁকা ছবি-গুলির চমৎকার আলোচনা ক'রে, সকলের চোখের সামনে তুলে ধরলেন তাদের রূপ আর ভাবের শ্রী।

শিল্পাচার্য নন্দলালের মনে তিনি এমন গভীর ছাপ রেখেছিলেন যে, উমা-তপস্যার ছবি আঁকার সময়ে নিবেদিতার রূপ তাঁর মনে জেগে উঠেছিল। আর শিল্পীদের গুরু অবনীন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল, কাদম্বরীর মহাশ্বেতা যেন নতুন মূর্তি ধরেছে নিবেদিতার মধ্যে।

অবনীন্দ্রনাথের অপরূপ বর্ণনাটুকু তুলে দিচ্ছি :

"কি চমৎকার মেয়ে ছিলেন তিনি। প্রথম তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয় আমেরিকান কনসালের বাড়িতে। ওকাকুরাকে রিসেপশান দিয়েছিল, তাতে নিবেদিতাও এসেছিলেন। গলা থেকে পা পর্যন্ত নেমে গেছে সাদা ঘাঘরা ; গলায় ছোট্ট-ছোট্ট রুদ্রাক্ষের একছড়া মালা, ঠিক যেন সাদা পাথরে গড়া তপস্বিনীর মূর্তি একটি।

আর একবার দেখেছিলুম তাঁকে। আর্ট সোসাইটির এক পার্টি, জাস্টিস হোমউডের বাড়িতে ; আমার উপর ছিল নিমন্ত্রণ করার ভার। নিবেদিতাকে পাঠিয়েছিলুম নিমন্ত্রণ-চিঠি একটি। পার্টি শুরু হয়ে গেছে। একটু দেরী করেই এসে-ছিলেন তিনি। বড়-বড় রাজা-রাজড়া, সাহেব-মেম গিস্-গিস্ করছে। অভিজাত বংশের বড় ঘরের মেম সব। কত তাদের সাজসজ্জার বাহার, চুল বাঁধারই কত কায়দা ; নামকরা সুন্দরী অনেক সেখানে। তাদের সৌন্দর্যে ফ্যাশানে চারদিক ঝলমল করছে। হাসি গল্প গানে বাজনায় মাত্। সন্ধ্যে হয়ে এল, এমন সময়ে নিবেদিতা এলেন। সেই সাদা সাজ, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, মাথার চুল ঠিক সোনালি নয়, সোনালি রূপোলিতে মেশানো উঁচু করে বাঁধা। তিনি যখন এসে দাঁড়ালেন সেখানে, কি বলব যেন নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্যে চন্দ্রোদয় হল। সুন্দরী মেমরা তাঁর কাছে যেন এক নিমেষে প্রভাহীন হয়ে গেল। সাহেবরা কানাকানি করতে লাগল। উডরফ্, ব্লান্ট এসে বললেন, 'কে এ?' তাঁদের সঙ্গে নিবেদিতার আলাপ করিয়ে দিলুম।

'সুন্দরী সুন্দরী' কাকে বলো তোমরা জানিনে। আমার কাছে সুন্দরীর সেই একটা আদর্শ হয়ে আছে। কাদম্বরীর

মহাশ্বেতার বর্ণনা—সেই চন্দ্রমণি দিয়ে গড়া মূর্তি যেন মূর্তিমতী হয়ে উঠল।"

১৯০৭ সালের শেষের দিক থেকে ১৯০৯ সালের মাঝামাঝি অবধি প্রায় দু'বছর নিবেদিতা ইউরোপ-আমেরিকায় কাটান। স্বাস্থ্য ভাল ছিল না, তবু কাজে ডুবে ছিলেন সারা সময়।

১৯০৯ সালের ২৬শে জানুয়ারী নিবেদিতার মা দেহত্যাগ করলেন। সেই মা, যিনি নিজের প্রথম সন্তানকে দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছিলেন। দেবতার ছোঁয়া-পাওয়া মেয়েটাকে শেষ দেখার বড় ইচ্ছা হয়েছিল তাঁর, মরণের আগে। মেয়ে আমেরিকা থেকে ছুটে এলেন লণ্ডনে, মায়ের বাড়াবাড়ি অসুখের খবর পেয়ে। শেষ কয়েক-দিন প্রাণভরে সেবা করলেন মার।

মৃত্যুর আগের দিন সন্ধ্যায় যখন থরথরিয়ে উঠল মায়ের জীর্ণ দেহ, নিবেদিতা প্রার্থনা করতে লাগলেন শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজীর কাছে, 'ওগো, তোমরা যত শীঘ্র পারো দয়া করে এঁকে তুলে নিয়ে যাও!'

পরদিন সকালে নিবেদিতা ও তাঁর বোন মায়ের বিছানার পাশে বসে আছেন—শেষ সময় ঘনিয়ে এল। নিবেদিতা স্পষ্ট অনুভব করলেন, স্বামীজী এসেছেন অলক্ষ্যে—এক জীবন থেকে অন্য জীবনে যাওয়ার দ্বার তিনি খুলে দিচ্ছেন। মায়ের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে নিবেদিতা চাপা স্বরে বললেন, 'হরি ওঁ! হরি ওঁ!'—যাতে ঐ কথাগুলি এ পৃথিবীর শেষ শব্দ হয় মায়ের কানে।

হিন্দুমতে দাহ করা হল তাঁকে, কেননা তাঁর শেষ ইচ্ছা ছিল তাই।

ভারতবর্ষে ফিরে আসার পরে নিবেদিতার বড়ো কাজের মধ্যে রইল—স্বামীজী সম্বন্ধে বইটি শেষ করা। দিনের পর দিন বইটির চিন্তায় কেটেছে; বইটির জন্য চিঠিপত্র জোগাড় করেছেন ইউরোপ-আমেরিকা ঘুরে। এবার সেটি শেষ করবেন।

শেষ করলেন। ১৯১০ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী, স্বামীজীর জন্মতিথি। অনেক চেষ্টায় বইটিকে বের করা সম্ভব হয়েছে এই পুণ্য দিনটিতে।

সন্ত বাঁধানো একখণ্ড বই নিয়ে নিবেদিতা ছুটলেন বেলুড়ে। স্বামীজীর ঘরে সোফার উপরে বইটি রেখে, হাঁটু গেড়ে চোখ বুজে বসলেন। প্রণাম করলেন। তাঁর সে প্রণাম চিরকালের জন্য অমর হয়ে আছে কালো অক্ষর-সাজানো পৃষ্ঠাগুলির মধ্যে।

বইটির নাম—'দি মাস্টার অ্যাজ আই স' হিম'—'আচার্যকে যেরূপ দেখেছি।'

বইটি শ্রেষ্ঠ ধর্মসাহিত্যের পর্যায়ে পড়ে—বিশেষজ্ঞেরা বললেন।

॥ ১৬ ॥

কাজের শেষ নেই। কিন্তু নিবেদিতা অন্তরে প্রস্থানগান শুনছেন। তাঁর কেমন যেন বিশ্বাস হয়েছে—স্বামীজীর কাছে দীক্ষার পরে এক যুগ অর্থাৎ ১২ বছর কাটলেই চুকে যাবে পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্ক।

কাজ থেকে মনও সরে যাচ্ছে ধীরে-ধীরে। বিপ্লব-রাজনীতিতে যাঁর সঙ্গে নিবেদিতার ঘনিষ্ঠ যোগ, সেই অরবিন্দ ঘোষ গ্রেপ্তার হয়ে জেলে গিয়েছিলেন। মানুষটি আগে থেকেই ধর্মপ্রবণ। জেলে গিয়ে সে প্রবণতা বেড়ে গেল। মুক্তি পাবার পরে কিছুটা রাজনীতির কাজ শুরু করলে আবার তাঁর গ্রেপ্তার হবার সম্ভাবনা দেখা গেল। নিবেদিতাই পরামর্শ দিলেন স্থানত্যাগে। অরবিন্দ তখন ইংরাজিতে 'কর্মযোগিন্' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা সম্পাদনা করছিলেন। নিবেদিতা পত্রিকা চালাবার ভার তুলে নিলেন—অরবিন্দ গোপনে চলে গেলেন ফরাসী-অধিকৃত পণ্ডিচেরীতে। অরবিন্দর পণ্ডিচেরী পৌঁছানোর খবর পাবার পরে নিবেদিতা পত্রিকা বন্ধ করে দিলেন।
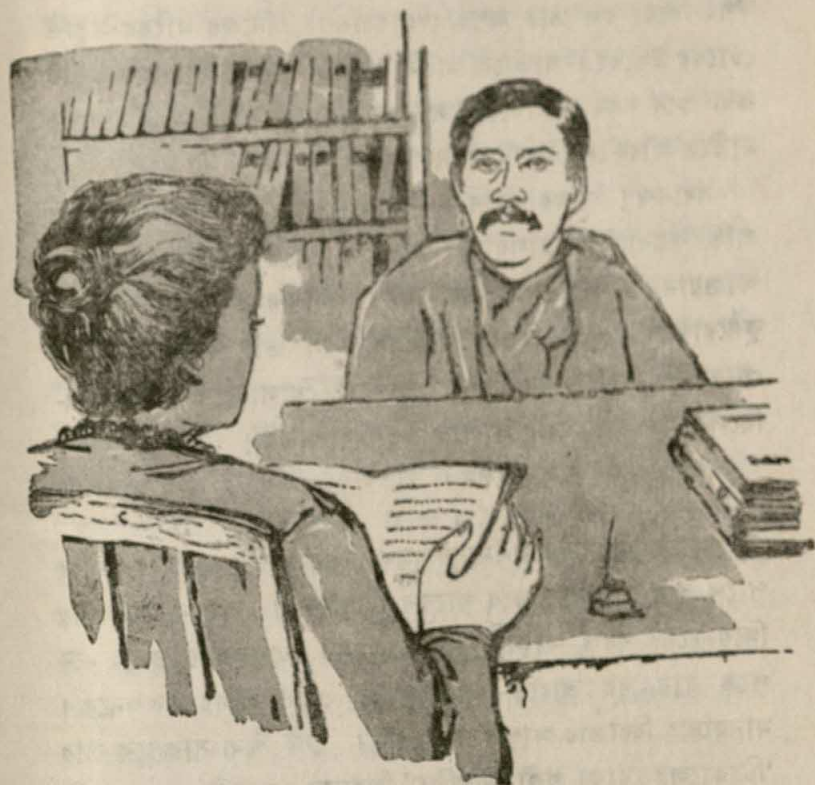
নিবেদিতার বাগবাজারের বাড়িতে অরবিন্দ ঘোষ আসতেন

প্রিয়জনদের বিয়োগবেদনা তাঁকে ঘিরেই ছিল সর্বক্ষণ। স্বামীজীর দেহত্যাগের পরে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু মন থেকে ছায়া যায়নি। স্বামীজীর শিষ্য স্বরূপানন্দকে গভীর শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর কাছে শাস্ত্রপাঠ করেছিলেন। কয়েক বৎসর আগে তিনি দেহত্যাগ করেছেন। গোপালের মা তাঁর আশী বছরের জীর্ণ শরীর নিয়ে এসেছিলেন এই বিদেশিনী কন্যাটির ঘরে। নিবেদিতার চোখের

উপর দিয়েই হল তাঁর অপূর্ব দেহাবসান। নিজের মায়ের মৃত্যুও চোখের উপরেই। পাতানো মা মিসেস ওলি বুলের মরণাপন্ন অবস্থার কথা শুনে যখন ছুটে গিয়েছিলেন আমেরিকায়, তারই মধ্যে ভারতের মাটিতে জীবন শেষ হয়ে গেল সদানন্দর।

সদানন্দ! অমর প্রাণ!—বিবেকানন্দের সেরা শিষ্য—মানুষের প্রতি কল্পনাতীত ভালবাসা যাঁর! নিবেদিতার প্লেগ-সেবাদলের আগুয়ান নেতা ছিলেন সদানন্দই। আনন্দময় নির্ভয় মানুষ। কুষ্ঠরোগীকে দেখে বিতৃষ্ণা হয়েছিল বলে তার ক্ষত চুম্বন ক'রে প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন। বসন্ত রোগীকে খোলা বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন, যদি তাতে তার জ্বালার কিছু নিবারণ হয়!

সেই সদানন্দ চলে গেলেন।

ওধারে আমেরিকায় মিসেস বুলও যাওয়ার পথে। তাঁর শয্যার পাশে বসে প্রার্থনায় ডুবে থাকেন নিবেদিতা। কখনো-বা গির্জায় গিয়ে মনের সমস্ত আকূতি নিবেদন করেন। এমন সময়ে হঠাৎ মনে পড়ে যায়, দূর ভারতে বাগবাজারের ছোট গলির একজনকে। মানবদেহে বিধাতার আশ্চর্য সৃষ্টি তিনি। সেই শ্রীমা সারদাকে তাঁর 'চিরকালের বোকা খুকী নিবেদিতা' লিখলেন এক চিঠি, ধূপের সুরভি মেশানো ভাষায়:

"আদরিণী মাগো, আজ সকালে খুব ভোরে গির্জায় গিয়েছিলাম সারা-র (মিসেস ওলি বুলের) জন্য প্রার্থনা করতে। সেখানে সবাই যীশুর মা মেরীর কথা ভাবছিল, হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল তোমার কথা। তোমার মিষ্টি মুখ, ভালবাসায় ভরা চোখ, সাদা সাড়ি, হাতের বালা; সব-কিছু সামনে ভেসে উঠল। তখন ভাবলাম, অভাগী সারার রোগের ঘরটিতে শান্তিতে আর আশিসে ভরিয়ে দিতে পারে একমাত্র তোমারই পরশ। আর মাগো, ভাবলাম, সন্ধ্যাবেলা শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজার সময়ে তোমার ঘরে বসে ধ্যানের চেষ্টা যখন

করতাম, কি বোকামিই হত! কেন বুঝিনি যে, তোমার শ্রীচরণের কাছে ছোট্ট মেয়েটির মতো বসে থাকাটাই সব—সব-কিছু! মা মা মাগো—ভালবাসায় ভরা তুমি! তোমার ভালবাসায় আমাদের মতো উচ্ছ্বাস বা উগ্রতা নেই। তা পৃথিবীর ভালবাসা নয়। তা স্নিগ্ধ শান্তি, সকলের কল্যাণ আনে, অমঙ্গল করে না কারো। সোনার আলোয় ভরা তা, খেলায় ভরা। সেই যে রবিবারটি, কয়েকমাস আগে, পুণ্যময় সেই দিনটিতে গঙ্গাস্নান সেরে ছুটে তোমার কাছে ফিরে এসেছিলাম এক মুহূর্তের জন্য, তখন তুমি আশীর্বাদ করেছিলে—আর কী যে শান্তি আর মুক্তি বোধ করেছিলাম!···সত্যই তুমি ভগবানের অপূর্বতম সৃষ্টি, শ্রীরামকৃষ্ণের স্মৃতিচিহ্ন, তাঁর নিঃসঙ্গ নিঃসহায় সন্তানদের জন্য। আমরা, তোমার সন্তানেরা, তোমার কাছে খুব শান্ত হয়ে চুপটি করে বসে থাকব। তবে মজা করবার জন্য একটু-আধটু গোলমাল করব বৈকি! সত্যই, ভগবানের অপরূপ রচনাগুলি সবই নীরব। তা অজানিতে আমাদের জীবনের মধ্যে প্রবেশ করে—যেমন বাতাস, যেমন সূর্যের আলো, যেমন বাগানের মধুগন্ধ, যেমন গঙ্গার রূপমাধুরী। এই সব নীরব জিনিসগুলি সব তোমারই মতো।”

মিসেস ওলি বুলও চলে গেলেন।

॥ ১৭ ॥

স্বামীজী নিবেদিতাকে অমরনাথে নিয়ে গিয়েছিলেন শিবের কাছে উৎসর্গ করবার জন্য। এ পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্ক সাঙ্গ করবার আগে আর একবার শিবতীর্থে ঘুরে এলেন নিবেদিতা। গিয়েছিলেন

কেদারনাথে। সেইসঙ্গে বদরীনাথে। সপরিবারে জগদীশচন্দ্র বসু সঙ্গে ছিলেন।

হাওড়া থেকে প্রথমে হরিদ্বার। মহাতীর্থের দ্বারপথ হরিদ্বার। হরিদ্বারের ব্রহ্মকুণ্ডে সন্ধ্যায় যখন আরতি হয়, স্বর্গের ছবি নামে চোখের সামনে। নিবেদিতা অতৃপ্ত নয়নে তাকিয়ে থাকেন। চার-পাশে সবুজ পাহাড়ের উপরে সন্ধ্যা টেনে দিয়েছে কুয়াশার আবছা ওড়না, আরতির জন্য পুরোহিত নেমে এসেছেন কুণ্ডের শেষ সিঁড়িতে। তাঁর হাতে শত-মুখী দীপ। সব ক'টি শিখা জ্বলে উঠে ছোট্ট দীপাধারকে দেখালো যেন আলোকতরু। সেটি তুলে নিয়ে তিনি দোলাতে শুরু করেন—আর ছায়া-কালো নীল জলের উপরে হাজার-হাজার দুরন্ত আলো-শিশুর কোলাহল মাতামাতি পড়ে যায়। তারপরে আরতি থেমে আসে ক্রমে, শাঁখ ঘন্টা নীরব হয়ে যায়, ভাসিয়ে-দেওয়া পাতার প্রদীপ টুপটুপ ডুবে যায় গঙ্গার ধারালো স্রোতে। নিবেদিতা তাকিয়ে থাকেন।

হরিদ্বার থেকে হৃষীকেশ। এখানেই মর্ত্যে নেমেছেন গঙ্গা। আছড়ে-পড়া জলের গর্জনে শোনা যায় হর্-হর্ ধ্বনি। এখান থেকেই পায়ে হেঁটে, ঘোড়ায় বা পাল্কিতে চড়ে, কেদার-বদরীর যাত্রারম্ভ।

সবাই চলতে থাকে। দিনের পর দিন পথ চলা। ভারতের সব জায়গার মানুষ, যাদের আচার ব্যবহার ভাষা সব আলাদা, তারা সবাই চলেছে একই তীর্থে। বাইরের নানা পার্থক্য সত্ত্বেও ভারত যে এক, অখণ্ড—নিবেদিতা আবার দেখেন তা।

'জয় কেদারনাথ স্বামী কি জয়!' 'জয় বদরী বিশাল কি জয়!'—যাত্রীরা পরস্পর দেখা হলেই সম্ভাষণ জানায় দেবতার জয় দিয়ে। সবাই চলেছে আনন্দে। দেবতাকে বুকে ধরে চলেছে তারা। হাতে তাদের জপমালা। মাঝে-মাঝে রয়েছে আশ্রয়স্থল, যার নাম চটি। যাত্রীরা সেখানে এসে থামে। সন্ধ্যায় আগুন জ্বালায়। রাত্রির রান্না করে। পূজা প্রার্থনা করে। গান গায়। এমনি এক চটির

কাছে বসে নিবেদিতার হঠাৎ মনে পড়ে যায়, বহু বছর আগে একদিন জেরুজালেমের চটিতে আশ্রয় না পেয়ে খ্রীস্টের মাতা-পিতা বাইরে আস্তাবলে রাত কাটিয়েছিলেন। সেখানেই ঈশ্বরপুত্র খ্রীস্টের জন্ম হয়। নিবেদিতা ভাবেন—কে জানে, এই মুহূর্তে যাকে জায়গা নেই বলে চটি থেকে ফিরিয়ে দেওয়া হল, সে অমনি কোনো যাত্রী কি না!

মহাভারতের স্মৃতিভরা এই পথ। মানুষের ব্যাকুল ভক্তির রেখা-আঁকা এই পথ। পথে যারা চলেছে দেবতা তাদের সহায়। দুটি বৃদ্ধা নারী, প্রায় অন্ধ, বয়সের ভারে নুয়ে-পড়া অথর্ব শরীর—তুষার-পিচ্ছল কঠিন পথ বেয়ে তাঁরা নামছেন বদরী দর্শন করে। তাঁদের একজন হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। নিবেদিতা তাড়াতাড়ি এগিয়ে যান সাহায্য করতে। অপরূপ আনন্দের হাসিতে ভরে যায় বৃদ্ধার মুখ। —'সাহায্যের দরকার কি মা? নারায়ণ দর্শন দিয়েছেন—তিনিই পথ দেখাচ্ছেন!'—বৃদ্ধা বলেন। তারপর নিজেই লাঠির উপরে কোনোক্রমে ভর করে উঠে কুঁজো হয়ে ঠুকঠুক করে চলতে থাকেন। 'কি সুন্দর হাসি!'—নিবেদিতার সমস্ত মন সেই হাসির আলোয় ধুয়ে যায়।

'কি সুন্দর মুখ ওঁর!'—আর একদিন অবাক হয়ে নিবেদিতা চেয়ে আছেন। এবার আরও থুথ্‌ড়ি বুড়ি, চুলগুলো ধবধবে সাদা; অলক-নন্দার বরফ-ঠাণ্ডা জলে স্নান ক'রে জোড় হাতে সূর্যকে প্রণাম করছেন।—'কি সুন্দর ওঁর মুখ!'—নিবেদিতা আস্তে-আস্তে বলেন।

'ভেবে দেখো, এখান থেকে মানস সরোবর মাত্র দশ-বার দিনের পথ! এর সব জায়গাটাই কৈলাস।'—যাত্রীদের মধ্যে কে যেন বলল! 'কৈলাস—শিবলোক!' পাইন-দেওদারের রহস্যঘেরা, পার্বত্য ফুলের গন্ধে মন্থর, আকাশভরা তারার নির্নিমেষ চোখের নীচে পৃথিবীর বুকে দাঁড়িয়ে নিবেদিতার মুগ্ধ প্রাণ ভাবে—কৈলাস? হতে পারে—অসম্ভব কি!

কঠিন চড়াই ঠেলে যখন কেদার-মন্দিরে পৌঁছলেন তাঁরা, তখন দুপুর, দরজা বন্ধ হয়ে গেছে মন্দিরের। বড় পবিত্র দিন সেটি। এই দিনটিতে মন্দিরে পৌঁছবার জন্য তাঁরা কত কষ্ট করেছেন! দ্বার বন্ধ। তাই আকুল চিত্তে অপেক্ষা করেন। সন্ধ্যারতির সময়ে দরজা খুলবার কথা। বিকালে নীলাভ কুয়াশায় ঢেকেছিল চারিদিক। সন্ধ্যায় কুয়াশা সরে গিয়ে খুলে গেল সদ্য তারা-ফোটা আকাশ, আর বরফের ঝকঝকে শিখর। মন্দিরে আলো জ্বলেছে। শুরু হয়েছে ঘণ্টাধ্বনি। শুরু হয়েছে আরতি। বহু দূর পথ ভেঙে এত কষ্ট করে যারা এসেছে, তাদের চোখের আলোই যেন আরতির দীপ। আরতির প্রদীপের শেষ দোলাটুকু যেমনি থামল—অমনি শত-শত যাত্রীর বুকের আনন্দ যেন শিউরে কেঁপে ছড়িয়ে পড়ল মন্দিরের প্রতি বিন্দুতে। এখন সবাই এগিয়ে আসছে রুদ্ধশ্বাসে—ঝুঁকে পড়ছে—স্পর্শ করছে—আর জড়িয়ে ধরতে চাইছে পবিত্র শিবপ্রতীককে। আসছে—আসছে—মানুষ আসছে! মানবনদীর বাঁধ ভেঙে ঢেউয়ের পর ঢেউ দেবতার চারিদিক ঘিরে দুলে-দুলে ফুলে-ফুলে উঠছে—পরমাশ্চর্য দৃশ্য! নিবেদিতা প্রাণভরে দেখেন।

এক বৃদ্ধ এসেছেন বহু কষ্টে। দীর্ঘদিন অসুস্থ তিনি। শেষ বাসনা তাঁর—যদি বাবা কেদারনাথের দর্শন পান! সে দর্শন তিনি পেয়েছেন। ব্যস্ত হয়ে পূজা শেষ করছেন—পাছে পূজা শেষ হওয়ার আগেই নিজে শেষ হয়ে যান!

পূজা শেষ। তৃপ্তির আবেশটুকু মুছে যায়নি মুখ থেকে। তারই মধ্যে—তাঁর এ জীবনের সংগ্রামও শেষ। সোনার আলোর রথে চড়ে তাঁর মুক্ত আত্মা চলে গেল অজানা লোকে।

'মহাদেবের আশীর্বাদ ভক্তের প্রতি; করুণার শেষ নেই তাঁর!' —নিবেদিতা সেই দৃশ্য দেখে ভাবেন।

প্রায় দেড় বছর পরে।

কাঞ্চনজঙ্ঘার দিকে চোখ রেখে নিবেদিতা শুয়ে আছেন। বসু-পরিবারে সঙ্গে দার্জিলিঙয়ে এসেছিলেন, সহসা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। সবাই ব্যাকুল হয়ে সেবা করে। নিবেদিতা ভরা মনে হাসেন। যতই চেষ্টা করুন ওঁরা, 'সময় হয়েছে নিকট এখন, বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।' দীক্ষার পরে বার বছরের মেয়াদ পূর্ণ। আছেনও এখন হিমালয়ে, শিবলোকে। আছেন নিজের ভবনে, নিজের ভুবনে।

নিবেদিতার দিকে তাকিয়ে অবলা বসুর মনে হল—ঐ তো দূরে হিমগিরির শিখর, আর এই সামনে শুয়ে আছেন হৈমবতী! হিমালয়ের তুষারের মতোই শুভ্র এঁর অন্তর-বাহির। শরৎকাল এখন। এই সময়েই গিরিরাজকন্যা আসেন পিতৃগৃহে। উমার মতো এই মেয়েটিও এসেছেন তাঁর পিতার ঘরে।

শিব! শিব! নিবেদিতার গুরু শিবস্বরূপ! হিমালয় শিবগেহ। নিবেদিতা চিরতরে ঘুমিয়ে পড়তে চান এবার।

নিবেদিতা তাঁর প্রিয় একটি বৌদ্ধ প্রার্থনা পড়ে শোনাতে বললেন—

> "শত্রুহীন, বাধাহীন, দুঃখজয়ী, আনন্দপ্রাপ্ত যাহা কিছু আছে, সে সকলের শ্বাস প্রবাহিত হউক, তাহারা নিজ-নিজ পথে মুক্ত গতিতে অগ্রসর হউক।
>
> পূর্বে এবং পশ্চিমে, উত্তরে এবং দক্ষিণে যাহা কিছু আছে, যাহা শত্রুহীন, বাধাহীন, দুঃখজয়ী ও আনন্দপ্রাপ্ত, তাহাই নিজ নিজ পথে মুক্তগতিতে অগ্রসর হউক।"

চির আনন্দের, চির মুক্তির প্রার্থনা শুনলেন নিবেদিতা। সে প্রার্থনা যেন শান্তির উত্তরীয়খানি তাঁর উপরে বিছিয়ে দিল। চোখ বুজে মৃদুস্বরে উচ্চারণ করলেন ঃ

অসতো মা সদ্‌গময়
তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্মামৃতং গময়—

অসৎ হইতে আমাকে সত্যে লইয়া যাও,
তমসা হইতে আমাকে জ্যোতিতে লইয়া যাও,
মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতে লইয়া যাও—

১৯১১ খ্রীস্টাব্দের ১৩ই অক্টোবরের প্রভাত। আকাশ মেঘে ঢাকা। নিবেদিতার সামনে পৃথিবীর আলো নিভে আসছে। তিনি বললেন,

'আমার জীবনতরী ডুবছে, কিন্তু সূর্যের উদয় দেখবই।'

হঠাৎ মেঘ সরে গেল। ঝলমলিয়ে উঠল আকাশ। সূর্যোদয় হয়েছে। তারই একটি আলোকরেখা ঘরে প্রবেশ ক'রে, ফুলের মতো একরাশ আলো ছড়িয়ে দিল নিবেদিতার শান্ত মুখে, স্তব্ধ সারা দেহে।

নিবেদিতা চলে গেলেন, চিরতরে।